সতের বৎসর পরে

সতের বৎসর পরে

সতের বৎসর পরে

কয়েকটি রাজনৈতিক প্রবন্ধ

শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ এম্. এ. বি. এল.
প্রণীত

মডার্ণ বুক এজেন্সী
১০নং কলেজ স্কোয়ার,
কলিকাতা
১৩৪৫

প্রকাশক :
শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
মডার্ণ বুক এজেন্সী
১০নং কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা

মূল্য ১৲ টাকা মাত্র

মুদ্রাকর :
শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র সেন
সখা প্রেস
৩৪নং মুসলমানপাড়া লেন
কলিকাতা

ভুমিকা

চারি বৎসর পূর্ব্বে, আমার লেখা কয়েকটি সাময়িক প্রবন্ধ "হিন্দু কোন্ পথে ?" নামক গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাতে প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল মহাত্মা গান্ধী-প্রবর্ত্তিত রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের ধারা, এবং তদ্দরুণ হিন্দু জাতির, বিশেষতঃ বাঙ্গালী হিন্দু জাতির, রাজনৈতিক অবনতি। তাছাড়া, শিক্ষা ও অর্থনীতি বিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধও তাহাতে ছিল।

উক্ত গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইবার পরেও মাঝে মাঝে সাময়িক পত্রাদিতে রাজনীতি-বিষয়ক কিছু কিছু প্রবন্ধ লিখিতে হইয়াছে। তাহারই কয়েকটি এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

গ্রন্থখানির নাম দেওয়া হইয়াছে, "সতের বৎসর পরে"। বোধ করি ইহার কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা আবশ্যক। ১৯২০ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে মহাত্মা গান্ধী-কর্ত্তৃক অসহযোগ-নীতি প্রবর্ত্তিত হয়; সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতায় বিশেষ অধিবেশনে কংগ্রেস-কর্ত্তৃক ঐ নীতি গৃহীত হয় এবং তদনুসারে

নূতন শাসন-সংস্কারে প্রবর্ত্তিত ব্যবস্থা-পরিষদ্ প্রভৃতি বয়কট করা হয়। সেই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতের রাষ্ট্রীয় রঙ্গমঞ্চে অসহযোগ, বয়কট, সত্যাগ্রহ, আইন-অমান্য, প্রভৃতি নানাবিধ অঙ্ক অভিনীত হইতে থাকে। আর সতের বৎসর পরে, অর্থাৎ ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে, এই দীর্ঘ সপ্তদশ-বর্ষব্যাপী "নেতি"-"নেতি"-মূলক কর্ম্মপন্থা পরিহার-পূর্ব্বক কংগ্রেস-কর্ত্তৃক মন্ত্রিত্ব স্বীকার করিয়া নানা প্রদেশে শাসনকার্য্য পরিচালনের ভার গ্রহণ করা হয়। এই প্রবন্ধগুলিতে নানা দিক্ দিয়া এই সতের বৎসরের বিচিত্র লীলার কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে। তাই গ্রন্থখানির এই নাম-করণ।

শুধু শেষ দুইটি প্রবন্ধের বিষয় স্বতন্ত্র। "ঐক্যের আলেয়া" প্রবন্ধটিতে মস্লেম লীগের সহিত কংগ্রেসের যে ঐক্য-প্রচেষ্টা কিছুদিন ধরিয়া চলিতেছে, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা আছে। আর "হাব্সী-সঙ্কট" প্রবন্ধটিতে ইটালীর আবিসিনিয়া-আক্রমণ প্রসঙ্গে বর্ত্তমান অন্তর্জ্জাতিক রাজনীতির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা গিয়াছে। উভয় প্রবন্ধই রাষ্ট্রনৈতিক বিধায় এই গ্রন্থে দেওয়া গেল।

ভরসা করি পূর্ব্ব গ্রন্থখানির ন্যায় এই গ্রন্থখানিও আমার দেশবাসিগণের চিন্তার কিঞ্চিৎ খোরাক যোগাইতে সমর্থ হইবে। ইতি

২৯শে শ্রাবণ, ১৩৪৫
কলিকাতা

শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ

সূচীপত্র

চৌদ্দ বৎসর

চৌদ্দ বৎসর

বিগত ভাদ্রসংক্রান্তি তারিখে ৺বিশ্বকর্ম্মা পূজার শুভদিনে বর্ত্তমান ভারতের স্বয়ংসিদ্ধ বিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা গান্ধী এক প্রস্থ বিবৃতি বাহির করিয়াছেন। বিবৃতিখানি ক্ষুদ্র নহে, পরন্তু দৈর্ঘ্যে প্রস্থে বিপুলকায়। গত চতুর্দ্দশ বৎসরে ভারতবর্ষের অবিসংবাদিত রাষ্ট্রনেতা ও আধ্যাত্মিক গুরু হিসাবে তিনি যে সমস্ত মন্ত্র প্রচার করিয়াছেন এবং যে সমস্ত কাণ্ড-কারখানা করিয়াছেন, এবং ইহার ফলে যে বিরাট্ ব্যর্থতার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহারই সম্পর্কে এই বিবৃতিখানি একাধারে কৈফিয়ৎ ও কাঁদুনী—এক রকম *apologia pro vita sua* বলিলেই হয়। সত্যই এই কৈফিয়ৎ-কাহিনী-খানা একটি অত্যন্ত interesting human document—১৯২০ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে যে experiment with truth বা তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার সুরু হইয়াছে, আজ চৌদ্দ বৎসর পরে ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে সেই জিজ্ঞাসার চির-নির্ব্বাণের সময়ে এই কাহিনীটি চিত্তাকর্ষক না হইয়া যায় না।

তবে নেহাৎ অনাধ্যাত্মিক ইহলোকসর্ব্বস্ব ইতর জনসাধারণের মনে শুধু এই কথাই জাগে, তবে কি এতদিন যে এত হৈ-চৈ, এত কাণ্ড, এত অসহযোগ, এত অহিংস সংঘর্ষ, এত ভারত-উদ্ধারের আড়ম্বর—ইহা শুধু একটি নিরীহ ছাগদুগ্ধপায়ী ধর্ম্মপিপাসু কৌপীন-বিলাসী ভদ্রলোকের তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার রকমফের মাত্র? ভারতের স্বাধীনতা-প্রয়াসী জনগণ ত ইহা ভাবিয়া আন্দোলনে যোগদান করে নাই, তাহারা ভারতের রাজনৈতিক উন্নতি ও উদ্ধারই কামনা করিয়াছিল—পারলৌকিক আধ্যাত্মিক তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার নিমিত্ত তাহাদের কোন শিরঃপীড়া জন্মে নাই।

কিন্তু আজ আক্ষেপ করিলে কি হইবে? যখন রাজনৈতিক বিচারবুদ্ধি বিসর্জ্জন দিয়া, নিজেদের স্বাধীন চিন্তা ও কাণ্ডজ্ঞানে জলাঞ্জলি দিয়া, শুধু নিরক্ষর জনসাধারণ নয় পরন্তু বুদ্ধিমান্ বলিয়া পরিচিত শিক্ষিত অভিজ্ঞ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ পর্য্যন্ত গান্ধীজীর কৌপীনের পশ্চাতে গিয়া আত্মবিলোপ করিলেন, এবং এই অদ্ভুত আধ্যাত্মিক ব্যক্তিটির বিচিত্র প্রকার তাত্ত্বিক experiment-এই তুল্য ভাবে বাহবা দিতে লাগিলেন,—এমন কি এই সব experiment-এর বিষম ব্যর্থতার সুস্পষ্ট পরিচয়ের পরেও যখন বাহবা দিবার প্রবৃত্তির সংযমের বিশেষ কোন পরিচয় দিতেছেন না,—তখন এই তত্ত্বজিজ্ঞাসুর বিবৃতিতে বক্রভাব ধারণ করিবার ইঁহাদের কোনই অধিকার নাই। নীরবে মাথা পাতিয়া মহাত্মাজীর এই বিবৃতি ও ব্যাখ্যা ইঁহাদের হজম করিতেই হইবে।

সংক্ষেপতঃ মহাত্মাজীর সেই বিবৃতি ও ব্যাখ্যা এই:

"আমি আশৈশব সত্যানুসন্ধায়ী—seeker after truth; জীবনে সত্যের সন্ধান লাভ করিবার নিমিত্ত আমি বহু প্রকার প্রচেষ্টা করিয়াছি; ব্যক্তিগত জীবনে, দাম্পত্য জীবনে, পারিবারিক জীবনে নানাবিধ পরীক্ষা করিয়াছি। বস্তুতঃ আমি ঐকান্তিক ভাবেই সত্যাগ্রহী বা সত্যের প্রতি আগ্রহসম্পন্ন। এমন কি সত্যাগ্রহের আদি ও অকৃত্রিম প্রবক্তা বলিয়া আমি দাবী করিতেও

দ্বিধা করি না। এই সত্যাগ্রহের ধান্দায়ই আমি রাজনীতিতে প্রবেশ করিয়াছি; ভারতবর্ষের স্বাধীনতাপ্রচেষ্টা এই সত্যাগ্রহের পরীক্ষা হিসাবেই আমার নিকট চিত্তাকর্ষক; এবং ভারতের স্বাধীনতাই হউক বা আর কিছুই হউক, কোন কিছুর জন্যই আমি আমার সত্যাগ্রহমন্ত্রের বিশুদ্ধি বিসর্জ্জন দিতে পারি না। বস্তুতঃ দেশের স্বাধীনতা লাভ আমার পক্ষে মুখ্য উদ্দেশ্য নহে, গৌণ উপায় বা পরীক্ষা মাত্র। মুখ্য ও চরম উদ্দেশ্য সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ। সুতরাং আমার এই বিশুদ্ধ মন্ত্রেরই যদি অপলাপ করিতে হয়, তবে ভারত-উদ্ধার গোল্লায় যাউক। সাফ কথা।"

ইংরাজীতে এই প্রসঙ্গে মহাত্মাজীর নিজের কথাগুলি এই:

"*Satyagraha*, of which civil resistance is but a part, is to me the universal law of life. *Satya* is truth, is my God. I can only search Him through non-violence and in no other way, and the freedom of my country as of the world is surely included in the search for truth. I cannot suspend this search for anything in this world or another. I have entered political life in pursuit of this search."

সুতরাং, ভারতের রাষ্ট্র-রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইবার পর এই সত্যানুসন্ধায়ী নটরাজের লীলাভিনয়ের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করা বোধ করি অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

সত্যের সন্ধানে বাহির হইয়া মহাত্মাজী বিধির বিড়ম্বনায় ভারতবর্ষের রাজনীতির সহিত জড়িত হইয়া পড়িলেন, আজ চৌদ্দ বৎসর পূর্ব্বে। জড়িত হইয়া পড়িবার পর তিনি কি করিলেন? সহসা আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন যে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট "শয়তানী" গবর্ণমেণ্ট—ইহার সহিত কোন প্রকার সাহচর্য্য করিলে আধ্যাত্মিক পতন অনিবার্য্য। সুতরাং ঘোষিত হইল অসহযোগ। তিনিই অসহযোগের সৃষ্টিকর্ত্তা—তাঁহার নিজের

ভাষায়, author of non-co-operation। এই আধ্যাত্মিক নেতা অপর একটি আধ্যাত্মিক আন্দোলন অর্থাৎ খিলাফৎ আন্দোলনের সাহচর্য্য ও সারথ্য গ্রহণ করিলেন, এবং এই ডবল আধ্যাত্মিকতার তোড়ে ভারতের রাজনীতি কোথায় ভাসিয়া গেল। এই কলিকাতা নগরীতে গঙ্গাতীরে ভারতীয় রাষ্ট্রবুদ্ধির গঙ্গাপ্রাপ্তি হইল ঠিক চৌদ্দ বৎসর পূর্ব্বে—১৯২০ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে।

ক্রমশঃই কংগ্রেস নামক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানটি আধ্যাত্মিক মন্ত্রশক্তির পীঠস্থান হইয়া উঠিতে লাগিল। আধ্যাত্মিকতার মহা অস্ত্রই হইল গুরুবাদ; সুতরাং যাঁহারা "আজ্ঞা গুরূণাং হ্যবিচারণীয়া" বিবেচনা করিয়া গুরুজীর ফতোয়া দ্বারা নিজেদের কার্য্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত করিতে প্রস্তুত হইলেন, তাঁহারাই মহাত্মাজীর শিষ্য বনিয়া গিয়া কংগ্রেসে রহিলেন; আর যাঁহারা এই নবীন গুরুর গুরুভার বরদাস্ত করিতে পারিলেন না, পরন্তু নিজেদের জ্ঞানবুদ্ধির প্রতিই অধিক আস্থাবান্ রহিলেন, তাঁহারা কংগ্রেস হইতে সরিয়া দাঁড়াইলেন, এবং স্বভাবতঃই গান্ধী-শিষ্যদের দ্বারা দেশদ্রোহী, ভীরু, কাপুরুষ, ইত্যাদি ভাষায় ভূষিত হইলেন।

বহু বৎসর পূর্ব্বে মহাত্মাজী তাঁহার রচিত "হিন্দ্ স্বরাজ" গ্রন্থে যে সমস্ত মৌলিক ও আধ্যাত্মিক সমাজ-তত্ব, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতি প্রচার করিয়াছিলেন, সেই সব তত্ত্ব ও নীতিগুলি তাঁহার আধ্যাত্মিক তূণীর হইতে মুহুর্মুহুঃ নির্গত হইতে লাগিল। এই তত্ত্বগুলির সহিত আমাদের দেশের শিক্ষিত সমাজের বিশেষ পরিচয় আছে কি না জানি না, কিন্তু পরিচয় থাকা উচিত; কারণ পরিচয় থাকিলে গান্ধী-জীবনের অনেক লীলা ও গান্ধী-চরিত্রের অনেক বৈচিত্র্যই সহজবোধ্য হইয়া উঠে। এই তত্ত্বগুলিকে লক্ষ্য করিয়াই লর্ড রোণাল্ডশে একদা রহস্য করিয়া বলিয়াছিলেন, They would send a thrill of horror through the Bar Libraries of Bengal।

এই "হিন্দ্ স্বরাজ" গ্রন্থে মহাত্মা গান্ধী গুরুশিষ্যের কথোপকথনচ্ছলে প্রচার করিয়াছেন যে রোগ হইলে চিকিৎসার চেষ্টা করা পাপ, কারণ প্রকৃতি-দেবীর উদ্দেশ্য এই যে তাঁহার বিধি লঙ্ঘন করিলে শাস্তিস্বরূপ রোগ আসিবে, এবং লোকের উচিত সেই রোগ পূরামাত্রাতে ভোগ করিয়া শাস্তি বরণ করিয়া লওয়া; ঔষধাদি প্রয়োগে চিকিৎসা করিলে প্রকৃতিকে বঞ্চনা করা হয় এবং এবম্প্রকার বঞ্চনা বা অসত্য আচরণ আধ্যাত্মিক উন্নতির পরিপন্থী। আরও বলিয়াছেন যে হাঁসপাতাল সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য,কারণ ইহা পাপের উৎপত্তি-স্থান—Hospitals are the breeding grounds of vice। তারপর বলিয়াছেন যে স্কুল-কলেজ আইন-আদালত সব বর্জ্জনীয়। পরিশেষে বলিয়াছেন যে মুদ্রাযন্ত্র থাকা উচিত নহে, রেলগাড়ী প্রভৃতি যানবাহনের যান্ত্রিক ব্যবস্থা থাকা উচিত নহে, দ্রব্যাদি উৎপাদনে যন্ত্রপ্রয়োগ উচিত নহে। কারণ, যন্ত্র মাত্রই বিধাতার বিধানের বিরোধী; বিধাতা দুইখানা হাত দিয়াছেন কাজ করিতে বা লিখিতে, মুখ দিয়াছেন কথা বলিতে, দুইখানা ঠ্যাং দিয়াছেন চলিতে; মানুষ যদি ইহার অতিরিক্ত কিছু করিতে প্রয়াস পায় তবে নিশ্চয়ই বিধাতা তাহার প্রতি বিমুখ হইবেন।

যদি কোন সংশয়াত্মা কু-তার্কিক বলে যে, বিধাতা ত শুধুই একজোড়া হাত ও একজোড়া ঠ্যাংই দেন নাই, তিনি ত কিঞ্চিৎ মস্তিষ্কও মাথার ভিতরে ঢুকাইয়া দিয়াছিলেন; এবং যদি মানুষ সেই মস্তিষ্কের প্রয়োগ করিয়াই নিজেদের কার্য্যের ও জীবন-যাপনের সুবিধার জন্য যন্ত্রাদি ব্যবহার করে তবে তাহাতে দোষ কি?—তবে হয়ত মহাত্মাজী উত্তর দিবেন যে বিধাতা পুরুষ যে মস্তিষ্ক দিয়াছিলেন এরূপ কোন প্রমাণ নাই; খুব সম্ভবতঃ এই কর্ম্মটি শয়তান দ্বারাই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, কারণ বাইবেলে স্পষ্টই লেখা আছে যে শয়তানের দৌলতেই আদিম মানব-দম্পতীর জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হইয়াছিল, এবং তদ্ধেতু বিধাতা ক্রুদ্ধ হইয়া উক্ত দম্পতীকে নন্দন-কানন হইতে বহিষ্কার করিয়া দিয়াছিলেন; সুতরাং মস্তিষ্ক চালনা

কদাপি ভগবানের অভিপ্রেত নহে। তাই ভগবদ্ভক্ত সত্যসন্ধ পুরুষ হিসাবে মহাত্মা গান্ধীও মস্তিষ্ক চালনায় প্রশ্রয় দিতে পারেন না, এবং মস্তিষ্কচালনা-প্রসূত যে সমস্ত যন্ত্রপাতি, তাহাও তিনি নিছক যন্ত্রণারই আকর বলিয়া মনে করেন।

যান্ত্রিক সভ্যতার বিরুদ্ধে সর্ব্বাঙ্গীণ অভিযান করিয়াও কিন্তু মহাত্মাজী ছোট্ট একটি যন্ত্রের মোহ এড়াইতে পারিলেন না। সেই যন্ত্রটি চরকা। এই চরকার মৃদু গুঞ্জনে, এমন যে ত্রিগুণাতীত মহাত্মা তিনিও অভিভূত হইয়া পড়িলেন, এবং এই সূত্র-চক্রকেই বর্ত্তমান ভারত-সমরের সুদর্শন-চক্র বলিয়া ঘোষণা করিলেন। এমন কি ভবিষ্য স্বাধীন ভারতের যে পতাকার পরিকল্পনা হইল তাহাতেও এই বিচিত্র চক্রটি শোভা পাইতে লাগিল।

প্রসঙ্গক্রমে গান্ধী-রচিত "হিন্দ্ স্বরাজ" গ্রন্থখানির অমূল্য তত্ত্বগুলির বিষয় একটু বিস্তৃত ভাবেই বলিলাম। ইহাতে এই লোকোত্তর চরিত্রের অনুধাবন করা একটু সহজ হইবে। বস্তুতঃ এই গ্রন্থখানিই তাঁহার জীবন-বেদ। গো-দুগ্ধের পরিবর্ত্তে ছাগ-দুগ্ধ পানে কেন যে সত্যানুসন্ধানের পথে দ্রুততর অগ্রসর হওয়া যায়, তাহা অবশ্য এই গ্রন্থে বিবৃত করা হয় নাই—শুনা যায় যে সে কাহিনী স্বতন্ত্র।

সে যাহা হউক, আমরা আধ্যাত্মিক রাজনীতির প্রগতির ইতিবৃত্ত আলোচনা করিতেছিলাম। কংগ্রেসের মত প্রতিষ্ঠান হাতে পাইয়া মহাত্মাজী, "হিন্দ্ স্বরাজ" পুস্তিকাখানিতে যে সমস্ত তত্ত্ব নিহিত ছিল, একেবারে ঠিক তদনুসারে যথাসম্ভব মনের মত করিয়া উহা গড়িয়া তুলিতে সুরু করিলেন। ইস্কুল-কলেজ আইন-আদালত ইত্যাদি বর্জ্জন করিবার ফতোয়া বাহির হইল। লোকে ভাবিল যে ইংরাজের উপর রাগ করিয়াই বুঝি এই সব অসহযোগ অভিমানের পালা—"শাদা মুখ হেরিব না" এই ভাব আর কি? কিন্তু তাহা নহে; বাহিরের ভড়ং যাহাই হউক, আসল কারণ নিহিতং গুহায়াং অর্থাৎ

কিনা গান্ধীজীর দার্শনিক মতবাদে—ইংরাজের সহিত কোন্দল অছিলা মাত্র।

চরকা স্বরাজ-লাভের অমোঘ অস্ত্র বলিয়া ঘোষিত হইল; যে ব্যক্তি চরকায় সূতা কাটিতে না পারিবে এবং নিয়মিত মত মাসে মাসে দুই হাজার গজ সূতা প্রস্তুত করিতে না পারিবে, সে কংগ্রেসের সভ্যপদবাচ্যই হইতে পারিবে না, ইহাও ঘোষিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে স্বপাকে আহার সম্বন্ধে ও স্বহস্তে ক্ষৌরকার্য্যে পারদর্শিতা সম্বন্ধে বিধি থাকিলেই আরও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কাটুনী-সঙ্ঘে পরিণত হইল। স্থির হইল, *Swaraj* lies through spinning yarn; দেশীয় কাপড়ের কল পর্য্যন্ত বর্জ্জনীয়ের কোঠায় ফেলিবার জন্য মহাত্মা গান্ধী বিস্তর চেষ্টা করিলেন। সম্পূর্ণ বয়কট করাইতে যদিও তিনি পারিয়া উঠিলেন না, তবুও বঙ্গলক্ষ্মী প্রভৃতি দেশীয় কাপড়ের কলের বস্ত্রে অপেক্ষা শুদ্ধ খদ্দরে মণ্ডিত হওয়া বেশী দেশভক্তির পরিচায়ক বলিয়া পরিগণিত হইল—patriotism-এর সুরভি খাদি হইতেই কিঞ্চিৎ বেশী পরিমাণে নিঃসৃত হইতে লাগিল। তাছাড়া যে সব সূক্ষ্ম বস্ত্রের সূতা বিদেশাগত কিন্তু যাহার বয়ন সম্পূর্ণরূপে দেশীয় লোকের হস্তে, তাহার উপর ত পূরামাত্রাতেই বয়কট ঘোষণা হইল। ফলে সূক্ষ্ম-বয়ন-ব্যবসায়ী ফরাসডাঙ্গা শান্তিপুরের তাঁতীদিগের মধ্যে হাহাকার উঠিল, তাহাদের সূক্ষ্ম শিল্প লোপ পাইবার উপক্রম হইল, পৈতৃক ব্যবসায় হারাইয়া তাহারাও বেকারদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে লাগিল। এই প্রকার অদূরদর্শিতায় ও হঠকারিতায় আমাদের দেশের বস্ত্রশিল্পের যে সমূহ ক্ষতি হইল, মহাত্মাজীর চরকার ঘর্ঘর নিনাদে সেদিকে কেহ মনোযোগ দিবারও অবকাশ পাইলেন না।

আবার এদিকে বিলাতী বস্ত্র বয়কট বিষয়ে মহাত্মা এক মহা আধ্যাত্মিক গোলমাল আবিষ্কার করিয়া বসিলেন। মহাত্মা বলিয়া বসিলেন যে বিলাতী বস্ত্র বয়কট অত্যন্ত বিদ্বেষ-মূলক; অতএব তাহা বাতিল; প্রেম-মূলক programme বাহির করিতে হইবে। ঠিক হইল সমস্ত বিদেশী বস্ত্র বয়কট করিতে হইবে। দেশবাসী ত মহাত্মাজীর বিশ্ব-প্রেমের বহর

দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল, ভাবিল, সে কি কথা? বিলাতের সহিত না হয় আমাদের একটা প্রেমের লড়াই-ই চলিতেছে, কিন্তু অন্যান্য বিদেশ কি অপরাধ করিল যে বয়কটরূপ প্রেমাস্ত্র তাহাদের প্রতি নিক্ষেপ করিতে হইবে? মহাত্মাজী কিন্তু অটল; কারণ তাঁহার philosophy ঠিকই আছে—শুধু বিলাতী বস্ত্র বয়কট করিলে কি হইবে, সমস্ত কলে প্রস্তুত বস্ত্র বয়কট করিতে হইবে, নহিলে যে চরকা অচল; অতএব, boycott of all foreign cloth স্থির হইল—ইহাতে আর বিদ্বেষের কোন বীজাণু রহিল না। কিন্তু ওদিকে বিলাতের প্রতি অহিংসা এমন উৎকট হইয়া উঠিল যে, মহাত্মাজী ঘোষণা করিলেন, বিলাতী কাপড় স্পর্শ করাও পাপ, অর্থাৎ কিনা sin; সুতরাং নিজেরা সে কাপড় বর্জ্জন করিয়া আমাদের দেশের বস্ত্রহীন দরিদ্র নরনারীদিগকে দান করিলেও সেই দরিদ্র দেশবাসীদিগকে পাপের ভাগীই করা হইবে, অতএব তাহাও নিষিদ্ধ। ঠিক হইল যে ঐ সব পাপ বস্ত্র অগ্নি-সংযোগে দাহ করিতে হইবে—বাসাংসি জীর্ণানি পাবক কর্ত্তৃক নিঃশেষিত হইলে, ভারতের আকাশ বাতাস পুনরায় পূতপবিত্র হইয়া উঠিবে। মহাত্মার খিলাফতী বন্ধুরা বলিলেন, অতগুলি কাপড়, তা' না পোড়াইয়া তুরস্কে পাঠাইলে হয় না? গান্ধীজী শেষটা রাজী হইলেন, বলিলেন, আচ্ছা, স্মার্ণায় পাঠাইতে পার, ভারত নিষ্পাপ হইলেই হইল।

ওদিকে ইস্কুল-কলেজ হইতে দলে দলে ছেলে বাহির করিবার প্রচণ্ড প্রচেষ্টা চলিতে লাগিল। বাঙ্গালার চিত্তরঞ্জন—যিনি কলিকাতায় মহাত্মাজীর বিরোধিতা করিয়া তিন মাস পরে নাগপুরে তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন—এবং চিরদিনই যিনি abandon এবং impulsiveness-এর জন্য বিখ্যাত ছিলেন—তিনি এই ছাত্র-বহিষ্কারে ব্রতী হইলেন। ছেলেদের পরকাল ঝরঝরে করা ছাড়া ইহাতে যে কি লাভ হইল তাহা কাহারও বোধগম্য হইল না—"শয়তানী" গবর্ণমেণ্টের ত কেশাগ্রও স্পর্শ হইল না। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? গুরুজীর আদেশ; অতএব কর ছেলে চীৎ—

চালাও horizontal non-co-operation ; ফলতঃ ছাত্র বাহির করিবার আন্দোলন পূরা মাত্রাতেই চলিতে লাগিল।

স্বরাজ সম্বন্ধে মোটামুটি লোকের যে একটা ধারণা ছিল যে উহার অর্থ দেশের শাসনতন্ত্র দেশীয় লোকদিগের করায়ত্ত করা, তাহাও যেন আধ্যাত্মিকতার আবর্ত্তে পড়িয়া কি রকম গোলমাল হইয়া যাইতে লাগিল। নূতন শাসন-সংস্কারে দেশের লোকেরা যে পরিমাণে কর্ত্তৃত্ব পাইয়াছে সেই কর্ত্তৃত্বের যাঁহারা সদ্ব্যবহার করিতেছিলেন, যথা দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি, তাঁহারা ত ততদিনে দেশদ্রোহীই সাব্যস্ত হইয়া গিয়াছেন। এমন কি,কি উপায়ে আরও অধিক ক্ষমতা অর্জ্জন করিতে হইবে, স্বরাজের কাঠামটারই বা কি আকার ধারণ করা উচিত, এ সম্বন্ধে ধীর স্থির আলোচনা পর্য্যন্ত slave mentality-র পরিচায়ক বলিয়া গণ্য হইতে লাগিল। নরম-পন্থী সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতির ত কথাই নাই, তাঁহারা ত ততদিনে অপাঙ্‌ক্তেয়ই হইয়া গিয়াছেন ; মনীষী রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ গরম-পন্থী বিপিনচন্দ্র পাল পর্য্যন্ত যেদিন বরিশাল প্রাদেশিক সমিতির সভাপতিরূপে স্বরাজের একটু সংজ্ঞা একটু বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিতে প্রয়াস পাইলেন, অমনি তাঁহার ভূতপূর্ব্ব রাজনৈতিক শিষ্য এবং তদানীন্তন মহাত্মাজীর চেলা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন, I am not a scheming man, স্বরাজের আবার scheme কি ? *Swaraj* is *Swaraj* —এবং এই বিরাট্‌ হুঙ্কারের ফলে বিপিনচন্দ্রের ন্যায় দেশবরেণ্য বিচক্ষণ রাষ্ট্রনেতা কংগ্রেসী রাজনীতির ক্ষেত্র হইতে একেবারে নির্ব্বাসিত হইলেন। Soul-force-এর দৌলতে *furor theologicus* তখন উদ্দাম—কাজেই magic-এর নিকট logic পরাজিত হইল। আজ চৌদ্দ বৎসর পরে magic-এর মোহ তিরোহিত, আর logic-এর শক্তি পুনরায় প্রকট হইয়াছে।

ভাবপ্রবণ চিত্তরঞ্জন শুধু ছাত্র-বহিষ্কার ছাড়া আরও একটি মহৎ কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। এতদিন পরে হয়ত অনেকের তাহা স্মরণ নাই ; কিন্তু বাঙ্গালাতে গান্ধী-প্রবর্ত্তিত আধ্যাত্মিক বা sentimental

আন্দোলনের ইতিহাসে উহা একটি স্মরণীয় ঘটনা। আসামে কুলী ধর্ম্মঘট এবং আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে ও ষ্টীমার কোম্পানীর কর্ম্মচারীদিগের ধর্ম্মঘট প্রায় যুগপৎ সংঘটিত হইল। ইংরাজ চা-কর ও ইংরাজ পরিচালিত রেলওয়ে ও ষ্টীমার কোম্পানী বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং আধ্যাত্মিক অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের নেতারা ইংরাজকে জব্দ করিবার এমন সুযোগে কি আর নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারেন? অতএব বাঙ্গালার তিলক-স্বরাজ্য-ফণ্ডের যাবতীয় টাকা এবং আন্দোলনের বিপুল গণশক্তি এই ধর্ম্মঘট চালাইবার জন্য নিয়োজিত হইল। দেশবন্ধু মহাশয় নৌকায় চড়িয়া পদ্মা পাড়ি দিলেন এবং চাঁদপুরে গিয়া ঘোষণা করিলেন, The foundations of *Swaraj* have been laid at Chandpur; বাঙ্গালা দেশ চমৎকৃত হইল। কিছুকাল পরেই আন্দোলনকারীদিগের ধনবল ও জনবল ফুরাইয়া আসিল, ধর্ম্মের ঘটটি চৌচীর হইয়া ফাটিয়া ভাঙ্গিয়া গেল। প্রায় দশ হাজার লোকের চাকুরী গেল, এবং তাহারা উত্তর-জীবনে জীবিকার প্রত্যাশায় দ্বারে দ্বারে ফিরিয়া বিফলমনোরথ হইয়া আধ্যাত্মিক নেতাদিগের শিরে আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিতে লাগিল; আর রেল কোম্পানী ও ষ্টীমার কোম্পানী ভাড়া বাড়াইয়া দিয়া কিছু দিনের মধ্যেই তাহাদের সমস্ত লোকসান পূরণ করিয়া লইল। দেশবন্ধুর এই সুমহৎ প্রচেষ্টার ইহাই হইল লাভ-লোকসানের খতিয়ান। বস্তুতঃ, ঠিক ধর্ম্মঘট হিসাবে হয়ত ইহার সপক্ষে এবং বিপক্ষে অনেক কথাই বলিবার থাকিতে পারে, এবং প্রবল প্রতিপক্ষের সহিত বল পরীক্ষা করিতে গিয়া হারিয়া যাওয়াতে হাস্যাস্পদ হইবার কোন কারণ না থাকিতে পারে; কিন্তু এই সামান্য ব্যবসায়ঘটিত ধর্ম্মঘটকে ফেনাইয়া তুলিয়া ইহা দ্বারাই স্বরাজের ভিত্তি গড়িয়া তুলিবার মত বাতুলতাকে হাস্যাস্পদ ভিন্ন আর কোন আখ্যা দেওয়া সম্ভব নহে।

আর এই রকম কাণ্ডজ্ঞানের অভাব, sense of proportion-এর অভাব যে গান্ধী-প্রচারিত রাষ্ট্রীয় গুরুবাদের কল্যাণে কতদিকে প্রকটিত হইয়াছে

তাহার আর ইয়ত্তা নাই। চিত্ত যখন মোহাবিষ্ট, judgment যখন paralysed, তখন যে চিন্তায় জড়তা জন্মিবে এবং গড্ডলিকা প্রবাহের ন্যায় 'অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ' অবস্থা দাঁড়াইবে, ইহা আর বিচিত্র কি? বিপিনচন্দ্র সত্যই বলিয়াছিলেন, আধ্যাত্মিক জীবনেই গুরুবাদ যদি তামসিকতা আনয়ন করে, তবে রাজনৈতিক জীবনে ত pontifical authority-র প্রচলন একেবারেই সর্ব্বনাশকর। চিন্তার স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়া, যুক্তির স্বাতন্ত্র্যকে বলি দিয়া, দাস-মনোবৃত্তি অবলম্বন করিয়া আর যাহাই করা সম্ভব হউক স্বদেশের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জ্জন করা সম্ভব নহে।

কত ধাপ্পা, কত বুজরুকীই যে চলিল তাহা ভাল করিয়া এখন মনেও নাই। কিছুদিন চলিল এক flag-আন্দোলন। রাস্তায় রাস্তায়, এমন কি পুলিশ ষ্টেশনে পর্য্যন্ত স্বাধীন ভারতের চরকা-লাঞ্ছিত পতাকা উড্ডীন করিতে হইবে, অথচ স্বাধীন ভারতের সঙ্গে দেখাই নাই। আরও কত কি। শুধু bluff and bluster, শুধু demonstration দ্বারা জাতীয় জীবনে যেটুকু বা শক্তি ও উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছিল তাহাও প্রাই সবটুকুই ব্যয়িত হইয়া গেল—লোকদেখান নাটকীয় অভিনয় এবং সংবাদপত্রে ঢক্কানিনাদেই সব পর্য্যবসিত হইল। মহাত্মাজী স্বয়ং এক inspired moment-এ ঘোষণা করিলেন, *Swaraj* by the 31st December। চিন্তাশীল লোকেরা আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিল, লোকটা বলে কি? ইহার মাথা খারাপ হইয়া গেল না কি? এত বড় প্রবল প্রতাপান্বিত ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট, তাহার এত সৈন্য সান্ত্রী প্রহরী, ইহা কয়েকদিনের মধ্যেই অহিংস ফুৎকারে একেবারে উড়িয়া যাইবে? এও ত বড় তাজ্জব ব্যাপার। কিন্তু ভক্তদলের তখন বুঁদ অবস্থা, চিত্ত তখন সুষুপ্ত, ঠিক যেন hypnotised; যেন যাদুকরের ইঙ্গিতে উঠিতেছে, পড়িতেছে, হাসিতেছে, কাঁদিতেছে। তাহারা বলিল, ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে স্বরাজ হইবে কিরূপে তাহা ত বুঝি না, কিন্তু হইবেই যে তাহাতে সন্দেহমাত্রং নাস্তি—স্বয়ং মহাত্মাজীর আপ্তবাক্য বাহির হইয়াছে যে। হায়, সে ৩১ শের

পর ক্ষত ৩১শে ডিসেম্বর আসিল চলিয়া গেল—ভারতের স্বরাজ কিন্তু এখনও আসিল না! তবে অবশ্য মহাত্মাজীর spiritual *Swaraj* আসিয়াও থাকিতে পারে—যদিও তাঁহার আজিকার এই মর্ম্মভেদী ক্রন্দনের পরে সে বিষয়েও সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে। তবে সুলক্ষণের মধ্যে আজ এইটুকু দেখা যাইতেছে যে সেই গুরুবাদ এবং hypnotism যেন কতকটা শিথিল হইয়া আসিয়াছে এবং জাতির সেই তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থার পর জাগরণের কিঞ্চিৎ লক্ষণ দেখা যাইতেছে।

যাহা হউক অহিংসার লড়াই ত চলিতে লাগিল। আর সে কি প্রচণ্ড অহিংসা! ইহার দাপটে স্বাধীনভাবে গান্ধী-নিরপেক্ষভাবে কোন সভা-সমিতি করা, কোন আলাপ-আলোচনাদি করা পর্য্যন্ত দুরূহ হইয়া দাঁড়াইল। গান্ধীজীর soul-force-এর দৌলতে non-violence এমনই রপ্ত হইয়া উঠিল—in thought, word and deed—যে নির্ভীকভাবে কোন সভায় দাঁড়াইয়া কিছু বলিবার পূর্ব্বে life insure করা আবশ্যক হইয়া উঠিল। "Emblems of soul-force six feet long studded with brass-nails" ব্যবহৃত হইতে লাগিল প্রতিপক্ষের শিরোদেশে। সুতরাং বেশ নিরঙ্কুশ ভাবেই আধ্যাত্মিক আন্দোলন চলিতে লাগিল। আর ইংরাজের প্রতি প্রেম এত প্রগাঢ় ভাবেই প্রচারিত হইল যে, ইংলণ্ডের যুবরাজ ভারতে পদার্পণ মাত্রেই বোম্বাই সহর রক্তে রঞ্জিত হইয়া গেল এবং তাহার পর সহরে সহরে অহিংস হরতাল অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। তার কিছুদিন পরে ত চৌরীচৌরায় অহিংসার চরম অভিনয় প্রকটিত হইল। সেই সব বীভৎস অভিনয় দেখিয়া গান্ধীজী বলিলেন, *Swaraj* is stinking in my nostrils, এবং তাঁহার সত্যাগ্রহ অস্ত্র সংবরণ করিলেন। ভারত-উদ্ধার আপাততঃ স্থগিত রহিল। তারপর বহু বৎসর পরে আবার যখন ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে মহাত্মাজী Civil Disobedience সুরু করিলেন তখনও এমনই অহিংসার বীজ তিনি ছড়াইলেন দেশময় যে শোলাপুর হইতে পেশোয়ার পর্য্যন্ত আগুন জলিয়া উঠিল। বালকেও

জানে সেই প্রচলিত প্রবাদ, If you sow the wind you must reap the whirlwind; অথচ এত ঘটনা হইয়া গেল তাহাতে মহাত্মাজীর টনক নড়িয়াও নড়িল না। আজ চৌদ্দ বৎসর পরে হঠাৎ তাঁহার প্রতীতি হইল যে দেশে অহিংসার atmosphere নাই, তাঁহার চেলারা মুখে মুখে অহিংসার বুলি আওড়ায় বটে, কিন্তু অন্তর তাহাদের বিদ্বেষ-বিষে ভরপূর, সুতরাং ইহাদিগকে লইয়া আর বিশুদ্ধ সত্যাগ্রহ চলিবে না। অভিনব আবিষ্কার বটে!

চৌরীচৌরার নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর হিংসা-ভীরু মহাত্মা গান্ধী ভড়কাইয়া গিয়া তাঁহার আন্দোলন বন্ধ করিয়া দিলেন; অথচ মাত্র দুই মাস পূর্ব্বে লর্ড রেডিংএর আপোষ প্রস্তাব তিনি সদর্পে প্রত্যাখ্যান করিয়া দিতে ইতস্ততঃ করেন নাই — বিচক্ষণ রাষ্ট্রনেতা কিনা তাই। গান্ধী হাত গুটাইবা মাত্রই সরকার বাহাদুর হস্ত প্রসারিত করিলেন এবং বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া ছয় বৎসরের জন্য জেলে ঠুকিয়া দিলেন। দেশময় টুঁ-শব্দ হইল না—ভয়ানক mass-awakening হইয়াছিল কি না গান্ধী-আন্দোলনের soul-force-এর কল্যাণে তাই। অথচ ইহার তিন বৎসর পূর্ব্বে এই গান্ধীর গ্রেপ্তারেই দেশময় আগুন জলিয়া উঠিয়াছিল। মহাত্মাজীও আদর্শ বন্দীরূপে ইয়ারোদা কারামন্দিরে প্রবেশ করিলেন, এবং চরকা ও ছাগ-দুগ্ধ নিয়মিত ভাবেই চালাইতে লাগিলেন।

ইহার পর কয়েক বৎসরের ইতিহাসের বিস্তারিত আলোচনার আবশ্যকতা নাই। এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে অসহযোগ আন্দোলন একদম নিভিয়া গেল; চরকা-খদ্দর ও কাউন্সিল-বয়কটের শোচনীয় ব্যর্থতা দেখিয়া গান্ধীজীর অনেক বিশিষ্ট চেলা পর্য্যন্ত গান্ধী-পদ্ধতিতে সন্দিহান হইয়া উঠিলেন; চিত্তরঞ্জন-মতিলাল-প্রমুখ ব্যক্তিগণ ত স্বতন্ত্র দলই গড়িয়া তুলিলেন—স্বরাজ্যদল—কাউন্সিলে ঢুকিবার জন্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে যদিও রাজনৈতিক কাণ্ডজ্ঞান ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিতেছিল কিন্তু moral hypnotism-টি দূর হয় নাই। তাই গান্ধী-পদ্ধতির আমূল বিরোধিতা

করিতে যাইয়াও তাঁহারা অত্যুচ্চকণ্ঠে প্রচার করিতে লাগিলেন, আমরা গান্ধীকে মোটেই অমান্য করি না, উঁহার প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা আমাদের অচলাই রহিয়াছে, চরকা-খদ্দরেও আমাদের নিষ্ঠা অবিচলিত, ইত্যাদি—অর্থাৎ কপটতা ও মিথ্যাচরণের আর অবধি রহিল না। কি জন্য যে এই সব নেতৃগণ এরূপ করিতে লাগিলেন বুঝা যায় না, তবে মনে হয় যে নিজেদের উপর বিশ্বাস ও নির্ভরের অভাবই ইহার মূল কারণ। গান্ধীকে repudiate করিয়া নিজেদের নূতন কর্ম্মপদ্ধতি লইয়া দেশের সম্মুখে দাঁড়াইতে ঠিক ভরসা পাইতেছিলেন না, তাই গান্ধীর নাম exploit করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য বলিয়া মনে করিতেছিলেন। এই মিথ্যাচরণের ফলে এবং আত্ম-প্রত্যয়ের অভাবেই চিত্তরঞ্জন-চালিত গান্ধী-বিদ্রোহ তেমন ফল-প্রসব করিতে পারিল না। কাউন্সিলে গেলেন বটে, কিন্তু গান্ধীর অসহযোগের ভেক তখনও অঙ্গে ধারণ করাতে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিতে সাহস পাইলেন না, শুধু ব্যর্থ বিরোধিতা করিয়া শক্তির অপব্যয়ই করিলেন, বিশেষ কোনই কাজ হইল না। এই ত গেল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে।

নৈতিক ক্ষেত্রেও উন্নতি কিছুই হইল না। বিদ্রোহীদের মুখেও গান্ধীর প্রতি lip-worship, গান্ধীর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কোন কথা বলা blasphemy—এভাব চলিতেই লাগিল, সুতরাং hypnotism-এর যে বিষময় জড়তা তাহার বিশেষ কোন অপনোদন হইল না।

এই কারণে সেই সময় হইতে অদ্য পর্য্যন্ত কংগ্রেসী মহলে রাজনৈতিক প্রচেষ্টার ইতিহাস—মাঝে মাঝে half-hearted বিদ্রোহ সত্ত্বেও—কার্য্যতঃ গান্ধীর ব্যক্তিগত খামখেয়ালেরই ইতিহাস। এবং খামখেয়ালের কোন যুক্তিগত পারম্পর্য্য না থাকাতে এবং গান্ধীজীর হঠাৎ inspiration-গুলির সহিত রাজনৈতিক চিন্তা বা অভিজ্ঞতার বিশেষ কোন সম্পর্ক না থাকাতে এই কয়েক বৎসরের কংগ্রেসী ইতিহাস এক অদ্ভুত খাপছাড়া জগা-খিচুড়ীতে পরিণত হইয়াছে।

ইহার কোন একটা সঙ্গত rational ব্যাখ্যা দেওয়া সহজ নহে। এই বিষয়ে দুই একটা কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

(জেলে বৎসর দুই থাকিবার পরে হঠাৎ মহাত্মাজীর appendicitis হইল। রোগের চিকিৎসা এবং বিশেষতঃ হাঁসপাতালের প্রতি তাঁহার তাত্বিক বিরূপতা সত্ত্বেও "শয়তানী" গভর্ণমেণ্ট যখন তাঁহাকে হাঁসপাতালে প্রেরণ করিয়া রীতিমত অস্ত্রোপচার দ্বারা চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন তখন গান্ধীজীর কোন আপত্তি শুনা গেল না।) কবি দ্বিজেন্দ্রলাল ত বহু পূর্ব্বেই গাহিয়া গিয়াছেন, "অমন অবস্থায় পড়লে সকলেরই মত বদলায়"। চিকিৎসা দ্বারা রোগের উপশম হইলে পর গভর্ণমেণ্ট তাঁহার বাকী চারি বৎসরের জেল মকুফ করিয়া মুক্তিদান করিলেন মুক্ত হইয়াই তিনি দেখিলেন যে তাঁহার অসহযোগের আর টিকিটি পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে না; কয়েকটি নেহাৎ ভক্ত গান্ধী-শিষ্য টিম্ টিম্ করিতেছে, আর রাজনৈতিক আসর জমাইতেছে চিত্তরঞ্জন-মতিলালের স্বরাজ্যদল ; এবং চিত্তরঞ্জনের প্রবল ব্যক্তিত্বের সমক্ষে গান্ধীভক্ত no-changer-গণ বড় একটা সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিতেছে না।

প্রথমটা গান্ধী ঠিক করিলেন যে, একবার শক্তি-পরীক্ষা করিতে হইবে ; ধমকানি দিয়া চিত্তরঞ্জনের দলকে কাবু করা যায় কিনা সে চেষ্টা দেখিবেন ; তাই আহ্বান করিলেন আহ্‌মেদাবাদে অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস-কমিটির অধিবেশন। প্রথম দিনের অধিবেশনে মহাত্মাজী খুব লম্বাই চৌড়াই বুলি ঝাড়িলেন ; বলিলেন, Principle তিনি কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারেন না, ইহাতে যদি বন্ধু-বিচ্ছেদ এমন কি ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদ পর্য্যন্ত হয় হউক, সাবেক অসহযোগের programme অটুট ভাবে চালাইতেই হইবে। ইহার ফলে চিত্তরঞ্জন-প্রমুখ অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি সভা হইতে walk-out করিয়া গেলেন। মহাত্মাজীর ত চক্ষুঃস্থির—তাই ত, এ কি হইল ? ধাপ্পায় কোন কাজ হইল না। সব ভাবিয়া চিন্তিয়া রাত্রির মধ্যেই মতলব স্থির করিয়া

ফেলিলেন ; পরদিন সভাতে principle প্রভৃতি বড় বড় কথাগুলি বে-মালুম হজম করিয়া ফেলিয়া মিহি সুরে বলিলেন যে তিনি ইচ্ছা করিলে সভায় তাঁহার মত carry করিতে পারিতেন বটে, কিন্তু তাহা তিনি করিতে চাহেন না, এতগুলি গণ্যমান্য লোক যখন তাঁহার মতের বিরুদ্ধে তখন তাঁহারা তাঁহাদের ইচ্ছামত কর্ম্মপদ্ধতি অনুসরণ করিতে পারেন। একেবারে sweet reasonableness-এর অবতার আর কি ?

গান্ধী-চরিত্রের ইহা আর একটি বিশিষ্ট দিক্। লম্ফ-ঝম্প, tall talk, principle কপচানর অন্ত নাই, কিন্তু যেই উপযুক্ত মত পালটা আঘাতটি পড়িল অমনি একেবারে কেঁচো, এবং দুর্দ্ধর্ষ যে আঘাতকারী তাহার একেবারে পরম ভক্ত। যাহাকে বলে একেবারে শক্তের ভক্ত, নরমের যম। ইহা যে এক চিত্তরঞ্জনের সহিত শক্তি-পরীক্ষার বেলায়ই দেখা গিয়াছে তাহা নহে, বারংবারই এই একই লীলার অভিনয় হইয়াছে। দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

গোল-টেবিল বৈঠকে ডাঃ আম্বেদকরের ঘা খাইয়া তিনি আম্বেদকরের ভক্ত বনিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহাকে তুষ্ট করিবার জন্য পুণা-চুক্তি করিয়াছেন। বৈদ্যনাথে সনাতনী সম্প্রদায়ের লাঠির ঘা খাইয়া এবং পুণায় বোমার আওয়াজে আতঙ্কিত হইয়া সনাতনীদের উপর শ্রদ্ধা তাঁহার শতগুণ বাড়িয়া গিয়াছে ; এমন কি তাঁহাদের উপর বল প্রয়োগের প্রতিবাদস্বরূপ তিনি তাঁহার মামুলী প্রায়শ্চিত্ত এক সপ্তাহের উপবাস পর্য্যন্ত করিয়া ফেলিয়াছেন—অথচ এই সনাতনীদের উপর অত্যাচার গান্ধীর চেলারা তাঁহার জ্ঞাতসারেই পূর্ব্বে অনেকবার করিয়াছে, তখন সেদিকে দৃক্‌পাত করা তিনি দরকার মনে করেন নাই। সর্ব্বোপরি উদাহরণ হইল এই যে লর্ড আরুইনের সশ্রদ্ধ সহানুভূতি-মূলক ব্যবহারে গান্ধীর ঔদ্ধত্যের সীমা ছিল না ; অথচ লর্ড উইলিংডনের কড়া মুষ্টিযোগের পর তাহার সহিত "respectful co-operation" করিবার নিমিত্ত মহাত্মাজীর উন্মুখতা ও উৎকণ্ঠার আর সীমা নাই। সত্য সত্যই "লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কোঽনুবিজ্ঞাতুমর্হতি"।

প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীকে সমীহ করিয়া চলিতে হয়; বড়লোককে ত কখনও চটান চলে না—এবং মহাত্মাজীর কোষ্ঠীতে সে রকম কোন দিন লেখাও নাই। প্রমাণ, তিনি সর্ব্বদাই দুই বগলে দুইজন ক্রোড়পতি লইয়াই চলাফেরা করিয়া থাকেন, এক দিকে বাজাজ, আর একদিকে বিরলা। সুতরাং চিত্তরঞ্জন-মতিলালই মহাত্মাজীর আশীর্ব্বাদের অধিকারী হইলেন, সেই অভাগা গান্ধীভক্ত no-changer শ্যামসুন্দর, শরৎকুমারের দিকে তিনি আর ফিরিয়াও চাহিলেন না; এবং চিত্তরঞ্জনের স্বরাজ্যদলকে রাজনৈতিক আম্‌মোক্তারনামা দিয়া তিনি রাজনীতি হইতে অপসৃত হইলেন, এবং চিত্তরঞ্জনের জীবদ্দশায় আর এপথে পদার্পণ করেন নাই। দেখিয়া শুনিয়া সত্যই মনে হয় যে মাহাত্ম্যের সহিত snobbery-র সম্পর্ক খুব সুদূর নহে।

মহাত্মা ত কিছুদিনের মত সবরমতীতে গুহাহিত হইলেন। এদিকে চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে স্বরাজ্যদল ক্রমশঃ barren obstruction ছাড়িয়া কাউন্সিলের দ্বারা কতকটা constructive কাজ করিবার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলেন। কমিটিতে বসিতে লাগিলেন, মন্ত্রিত্ব লইতে সাহসে কুলাইল না বটে, তবে কোন কোন পদ অধিকার করিতে আরম্ভ করিলেন, কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে প্রেসিডেণ্ট-পদে স্বরাজ্যদলের অন্যতম নেতা বিঠলভাই প্যাটেলকে বসান হইল। এই ভাবে ধীরে ধীরে লজ্জা ভাঙ্গিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিন্তু এই অগ্রগতি এবং constructive tendency পূরামাত্রায় অবলম্বন করিবার পূর্ব্বেই সহসা চিত্তরঞ্জন লোকান্তরিত হইলেন। তিনি শুধু মৃত্যুর পূর্ব্বে ফরিদপুর প্রাদেশিক সমিতিতে সভাপতিরূপে তাঁহার ভবিষ্যৎ কর্ম্মপদ্ধতির কতকটা আভাস দিয়াছিলেন। চারি বৎসর পূর্ব্বে বরিশালে প্রচারিত বিপিনচন্দ্রের কর্ম্মপদ্ধতির সহিত তাহার বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না। কালের গতি সত্য সত্যই বিচিত্র!

কিন্তু দেশবন্ধুর বিরাট্ ব্যক্তিত্বের তিরোধানের পর যে সকল লোকের উপর স্বরাজ্যদলের পরিচালনার ভার গিয়া পড়িল, তাহাদের ত সে ব্যক্তিত্ব,

সে সাহস, সে তেজস্বিতা ছিল না। সুতরাং দেশবন্ধু তিন বৎসর পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই তাহারা কপচাইতে লাগিল, অগ্রসর হইতে ভরসা পাইল না; শুধু "দেশবন্ধু" "দেশবন্ধু" নাম জপ করিয়া popularity বজায় রাখিবার চেষ্টা করিল এবং বিশেষ করিয়া position-টি পোক্ত করিবার আশায় পুনরায় সবরমতীর মহাত্মার দ্বারে গিয়া "হত্যা" দিল। মহাত্মাজী বাঙ্গালা মুল্লুকে আসিয়া কাহাকেও রাজা কাহাকেও উজীর বানাইয়া দিয়া গেলেন; এবং তাঁহার আধ্যাত্মিক dictatorship-এর আর এক দফা আরম্ভ হইল। দেশবন্ধুর মৃত্যুর বৎসর খানেকের মধ্যেই আবার স্বরাজ্যদল কাউন্সিল ও এসেম্ব্লী হইতে walk-out করিল; তার পর কতবার যে তাহারা ঢুকিল এবং বাহির হইল তাহা গণনা করা দুঃসাধ্য। মোট কথা, পাঁচ বৎসর বেঘোরে ঘুরিবার পর দেশবন্ধু দেশের জাগ্রত জনশক্তির দ্বারা দেশের শাসন-যন্ত্র অধিকার করিবার প্রয়াসের যে অভিলাষ মৃত্যুর পূর্ব্বে করিয়াছিলেন—যে প্রচেষ্টা দূরদর্শী বিচক্ষণ সুরেন্দ্রনাথ গোড়া হইতেই করিয়াছিলেন—সে প্রয়াস ও প্রচেষ্টা আর সম্ভব হইল না। আবার সব আধ্যাত্মিকতা ও inner voice-এর আবর্ত্তে পড়িয়া ঘুরপাক খাইতে লাগিল।

সাইমন কমিশন আসিল নূতন শাসন-সংস্কারের বিষয় আলোচনা করিবার নিমিত্ত—তাহা বয়কট হইয়া গেল গান্ধী-চালিত কংগ্রেসের দ্বারা। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় যে মডারেট নেতারা, যাঁহারা সুরেন্দ্রনাথের জীবদ্দশা পর্য্যন্ত মাথা ঠিক রাখিয়াছিলেন, তাহারাও এ বিষয়ে গান্ধীর চেলাদের দলে ভিড়িয়া গেলেন—প্রকাণ্ড একটা সুযোগ নষ্ট হইয়া গেল জাতীয় ভাবে নূতন শাসন-পদ্ধতিকে গঠন করিবার। (তৎসত্ত্বেও সাইমন রিপোর্টে অনেক বিষয়ে খুব ভাল ভাল recommendation ছিল—তাহা খুব প্রশংসার বিষয়ই বলিতে হইবে। প্রদেশগুলিতে সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসন, জাতি ও ভাষা হিসাবে প্রদেশ গঠন, কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে আড়াই শত সভ্যের মধ্যে দেড় শত

"সাধারণ" অর্থাৎ হিন্দু নির্ব্বাচিত সভ্য করিবার নির্দ্দেশ, আর সর্ব্বোপরি যুক্ত-নির্ব্বাচন-মূলে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান এবং যদি নেহাৎই মুসলমানেরা যুক্ত-নির্ব্বাচনে রাজী না হন তবে লক্ষ্ণৌ-চুক্তি অনুসারে সভ্য-সংখ্যা-নির্দ্দেশ, আর সেনাবিভাগের খরচের একটা মোটা অংশ ইংলণ্ডীয় গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বহন, এই সকল এবং আরও অনেক চমৎকার নির্দ্দেশ সাইমন কমিশন করিয়াছিল।

কিন্তু তখন আমাদের কংগ্রেসী কর্ত্তাদের উত্তাপ কি? সে উত্তাপে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য evaporate হইয়া যাইবার যোগাড়। সবই "অদেয়ং অপেয়ং অগ্রাহ্যং" বলিয়া ফতোয়া বাহির হইল। লাহোর কংগ্রেসে পূর্ণ-স্বরাজের ঘোষণা হইল। স্বাধীনতার সঙ্গে সাক্ষাৎ নাই, কিন্তু "স্বাধীনতা-দিবস" অনুষ্ঠিত হইল। মোট কথা অনুষ্ঠানের আর কোন ত্রুটী রহিল না। আর অনেক গবেষণার পর, inner voice-এর সহিত অনেক পরামর্শ করিবার পর মহাত্মা গান্ধী পশ্চিম-সাগর-তীরে লবণাসুর বধ করিবার নিমিত্ত অভিযান করিলেন। বড়লাট আরুইন সাহেব যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও—জেলে পর্য্যন্ত লোক পাঠাইয়াও—তাঁহার এত সাধের গোল-টেবিলে মহাত্মাজীকে পাঠাইতে পারিলেন না।

মডারেটরা গেলেন, অনেক চেষ্টা চরিত্র করিয়া একটা Responsible Government-এর কাঠাম খাড়া করিলেন। তারপর তাঁহাদের অনুরোধে গবর্ণমেণ্ট গান্ধী ও তস্য চেলাদিগকে জেল হইতে ছাড়িয়া দিলেন। অনেক মানাভিমানের পর আরুইন সাহেবের সহিত মহাত্মাজী একদফা চুক্তি করিলেন এবং তাহার মাস কয়েক পরে দ্বিতীয় গোল-টেবিলে গেলেন। ততদিনে লর্ড আরুইন প্রস্থান করিয়াছেন এবং লর্ড উইলিংডন বড়লাটের গদীতে আসিয়া বসিয়াছেন।

মহাত্মা বিলাত যাইবার কিছুদিন পরেই তথায় শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের পতন হইল, এবং রক্ষণশীল-প্রধান National Government-এর প্রতিষ্ঠা হইল, অর্থাৎ মোটামুটি রাজনৈতিক আবেষ্টনেরই পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। গান্ধীজীর

অবশ্য এসব পার্থিব ব্যাপারের প্রতি দৃষ্টি ছিল না—তিনি নিজের ভাবেই বিভোর। গোল-টেবিলে গিয়া কাজ তিনি বিশেষ কিছু করিতে পারিলেন না, impression-ও যে বিশেষ কিছু করিতে পারিলেন এমনও মনে হয় না; তবে যেমন বরাবরই হইয়া থাকে, স্ত্রীলোক ও পাদ্রী ও sentimentalist মহলে তাঁহার কিছু প্রতিপত্তি জমিল, তাঁহার কৌপীনবস্ত ফটো লইতে অনেক camera-man আসিল, মোট কথা newspaper stunt এবং "character" হিসাবে তাঁহার বিজ্ঞাপন হইল মন্দ না।

তবে তাঁহার বিলাত-যাত্রা একেবারে নিষ্ফল হয় নাই; কারণ অকাজ তিনি বেশ খানিকটা করিয়া আসিলেন। তিনি যুক্ত-নির্ব্বাচন-মূলেও "হরিজন"দিগকে স্বতন্ত্র প্রতিনিধি বা reservation of seats দিতে অস্বীকার করিয়া তাহাদিগের নেতা ডাঃ আম্বেদকরকে একেবারে re-actionary-দিগের দলে ভিড়িতে বাধ্য করিয়া Minorities Pact এবং তাহারই ফলস্বরূপ Communal Award-এর পথ প্রশস্ত করিয়া আসিলেন। দেশে ফিরিয়া লর্ড উইলিংডনকে কিঞ্চিৎ পত্রাঘাত করিলেন এবং তাহার উপযুক্ত রকম জবাব পাইয়া পুনরায় আইন-অমান্যের হুমকি দেখাইলেন এবং অবিলম্বে গ্রেপ্তার হইয়া পুনরায় ইয়ারোদা জেলে প্রবেশ করিলেন। আপাততঃ মহাত্মাজীর রাজনৈতিক লীলা খতম হইল।

তারপর যাহা হইল তাহা ত একেবারে recent history—তাহার ঘাতপ্রতিঘাতে আজিকার ভারতের রাজনীতি জর্জ্জরিত। আম্বেদকরের গুঁতায় মহাত্মাজী ভয়ানক হরিজনভক্ত হইয়া পড়িলেন। Communal Award প্রকাশিত হইলে উহার হিন্দু-মুসলমান বণ্টন সম্বন্ধে কিংবা অন্য কোন বিষয়ে গান্ধী কিছুমাত্র উচ্চবাচ্য করিলেন না, কিন্তু হরিজন-বণ্টন বিষয়ে প্রতিবাদ স্বরূপ করিলেন একেবারে জীবন-পণ। উপবাস হইল; পুণা-চুক্তি হইল; মহাত্মার এখন-তখন অবস্থা, কাজেই গান্ধীভক্তদিগের আর দিগ্বিদিক্ জ্ঞান রহিল না—সেই মোহ, সেই hypnotism, সেই

paralysis of judgment ! কেহ মহাত্মাকে উপবাস হইতে বিরত হইতে জোর করিয়া বলিতে সাহস করিলেন না ; কেহ একথা বলিতে ভরসা পাইলেন না যে যদি কেহ স্বেচ্ছায় নিজের খেয়াল মত নিজের জীবন বিপন্ন করে তবে সে স্বচ্ছন্দে মরিতে পারে, কিন্তু তাহার খেয়াল খুসি করিবার জন্য কোন অন্যায়ের প্রশ্রয় দেওয়া যাইতে পারে না, দেশের অনিষ্ট ঘটিতে দেওয়া যাইতে পারে না—একথা বলিতে কাহারও বুকের পাটা হইল না। দেশের এতদূরই আধ্যাত্মিক অবনতি হইয়াছে ! সত্য কথা বলিতে কি, যদি দেশের মধ্যে স্বাধীন চিন্তা ও ব্যক্তিত্ব তেমন থাকিত যে গান্ধীর এবংবিধ খামখেয়ালী কার্য্যকলাপ ignore করিয়া নির্ব্বিকার থাকিতে পারে, তাহা হইলে মহাত্মাজীর খামখেয়ালীর মাত্রাও অনেক কমিয়া যাইত। সে যাহাই হউক, একেবারে তটস্থ হইয়া পণ্ডিত মালবীয় হইতে আরম্ভ করিয়া চুনাপুঁটি কংগ্রেসী পর্য্যন্ত পুণা-চুক্তিতে সহি করিয়া আসিলেন। একেবারে Sign in haste and recant at leisure আর কি ? আম্বেদকরের জয় সম্পূর্ণ হইল।

ইহার পর মহাত্মাজী ভারত-উদ্ধারের চিন্তা ছাড়িয়া হরিজন-উদ্ধারে লাগিয়া গেলেন। এমন কি যে "শয়তানী" গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থা-পরিষদ্ প্রভৃতি বয়কট করা এত বৎসর তাঁহার মূলমন্ত্র ছিল সেই পরিষদে মন্দির-প্রবেশ বিল পাস করাইবার জন্য চেলাদের আগাইয়া দিলেন। আরও কত কি ? আর কত রকম উপবাস যে অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল তাহার গণনা করাই শক্ত। এমন কি ভক্তরাও দিশাহারা হইয়া পড়িলেন। গুরুজী কখন্ যে কি করিয়া বসিবেন তাহা কেহ ঠাহর করিতে পারিল না। মহাত্মাজীর অন্তরে ঘন ঘন inner voice-এর ধ্বনি ঘোষিত হইতে লাগিল।

শুনা যায় যে ভূতপূর্ব্ব জার্ম্মাণ কাইজারের সহিত ভগবানের খুব দহরম-মহরম ছিল ; এমন কি তাঁহাদিগের সাহচর্য্য Kaiser God and Company নামে অভিহিত হইয়াছিল, কিন্তু কাইজারের পতনের পর

ভগবান্ বেচারী নেহাৎ বেকার হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই বেকার অবস্থা হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করিলেন মহাত্মা গান্ধী। গোল-টেবিলে যাইবার প্রাক্কালে মহাত্মাজী ভগবান্‌কে তাঁহার Adviser-General নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এবং নিশ্চিত সেই capacity-তেই ভগবান্ কিছু ঘন ঘন inner voice মারফত পরামর্শ পাঠাইয়া ইদানীং চাকুরী বজায় রাখিতেছেন। ইহা ছাড়া ত এত মুহুর্মুহুঃ দৈববাণীর আর কোন সঙ্গত ব্যাখ্যা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

যাহা হউক, আইন অমান্য আন্দোলন যখন নির্ব্বাণপ্রায় এবং হরিজন-আন্দোলন যখন খুব তোড়জোড়ের সহিত তাঁহার চেলারা চালাইতেছেন, এমন সময় একদিন হঠাৎ গুরুদেব ঘোষণা করিলেন যে তিনি একেবারে তিন সপ্তাহের উপবাস করিবেন; তাঁহার ভয়ানক searching of heart হইয়াছে, তাঁহার হরিজন-সেবকদিগের মধ্যে অশুচিতা প্রবেশ করিয়াছে, অতএব তাঁহার চিত্তশুদ্ধি আবশ্যক, প্রায়শ্চিত্ত চাই। কি এমন অশুচিতা, কি এমন শোচনীয় নৈতিক অধঃপতন সহসা তাঁহার চেলাদিগের মধ্যে গজাইল যে এত বড় একটা প্রায়শ্চিত্ত দরকার, হঠাৎ কেহ বুঝিতে পারিল না।

শুনিতে শুনিতে শুনা গেল, সেই যে এক মার্কিণ স্বৈরিণী শ্রীমতী ক্রাম কুক—যিনি গান্ধীজীর শিষ্যা হইয়া নীলা নাগিনী সাজিয়া সবরমতী আশ্রমে দিনাতিপাত করিতেছিলেন—এসব সেই রঙ্গিণী নাগিনীর কীর্ত্তি। গান্ধীজীর প্রিয়-শিষ্যা মিস্ শ্লেড হইতে আরম্ভ করিয়া অনেক মেমসাহেবই তাঁহার শিষ্যা হইয়াছেন, মহাত্মাজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করা unbalanced sentimentalist-দিগের মধ্যে একটা ফ্যাশান দাঁড়াইয়া গিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, কিন্তু এই নাগিনীটির মত কীর্ত্তিমতী আর কেহ নহেন। শুনা গেল যে ইনি অনেক experiment after thrill করিয়া এই ভারতীয় experimenter after truth-এর সকাশে আসিয়াছিলেন; কিন্তু এই বুদ্ধের সান্নিধ্য তেমন বেশী thrilling বোধ না হওয়াতে, thrill-এর

সন্ধানে গান্ধীজীর আশ্রমের তরুণ তাপসদিগকে ইনি ইহার রূপের নাগ-পাশে জড়াইয়াছিলেন ; এবং এই সংবাদ-প্রাপ্তিতে মর্ম্মাহত হইয়াই নাকি গান্ধীজী উপবাসের বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছেন। ভাবিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়, এত বড় যে মহাত্মা তাঁহার লোকচরিত্রের জ্ঞান কি অসাধারণ !

যাহা হউক, নাগিনীর নিঃশ্বাসে পুণ্য আশ্রম ত বিষায়িত হইয়া উঠিল। কিন্তু উপবাসান্তে হইল কি ? সবরমতী আশ্রম মহাত্মাজী ভাঙ্গিয়া দিলেন—এতদিনের অনুষ্ঠান একমুহূর্ত্তে চূরমার করিয়া দিলেন। আর সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয়, যে mass civil disobedience গান্ধীজীর রাজনৈতিক ব্রহ্মাস্ত্র, তাহা বন্ধ করিয়া দিলেন, এবং তৎপরিবর্ত্তে অতি ক্ষীণ ভাবে individual civil disobedience প্রচার করিলেন। কোথাকার জল কোথায় গড়াইল। এক স্বৈরিণী করিল ব্যভিচার আর বন্ধ হইয়া গেল ভারত-উদ্ধার। আধ্যাত্মিক রাজনীতি বটে !

কংগ্রেসী স্বরাজ-আন্দোলনে নীলা নাগিনীর স্থান—ইহা এক রোমাঞ্চকর ঐতিহাসিক গবেষণার বিষয়। নীলা নাগিনীর পরবর্ত্তী ইতিহাস আর আলোচনা করিবার আবশ্যকতা নাই। গান্ধীজী কেমন করিয়া উঁহাকে তাড়াইয়া দিলেন, আর শ্রীমতী কেমন করিয়া বৃন্দাবনে বনে বনে বল্লভের সন্ধানে ঘুরিতে লাগিলেন, তারপর কেমন করিয়া মহাত্মাজী উঁহাকে পুলিশে ধরাইয়া দিবার ফতোয়া প্রচার করিলেন, এবং কিছুদিন পরে কেমন করিয়া শ্রীমতী আবার স্বদেশে প্রস্থান করিয়া নূতন মধুচন্দ্রের ব্যবস্থা করিলেন তাহা সকলেরই সুবিদিত। শুধু বিস্ময়ের বিষয় এই যে রাজনৈতিক গুরুবাদে জাতির এমনই অধঃপতন হইয়াছে যে এই সব ব্যক্তিগত নোংরা ব্যাপার দ্বারাও জাতীয় আন্দোলন নিয়ন্ত্রিত হয় !

Civil disobedience ত নীলা নাগিনীর কল্যাণে mass হইতে individual-এ পর্য্যবসিত হইল। অনেক কংগ্রেসী নেতা এই তিন সপ্তাহ-ব্যাপী উপবাসান্তে মহাত্মাজীর শয্যাপ্রান্তে সমবেত হইলেন। কিন্তু এই সব

verbal jugglery এবং tom-foolery সোজাভাবে আক্রমণ করিতে কাহারও সাহসে কুলাইল না—যদিও সকলেরই মনে মনে তখন দৃঢ় প্রতীতি যে কি individual কি mass, গান্ধী-মার্কা সব disobedienceই as dead as mutton। মালবীয়-প্রমুখ সব নেতারাই গান্ধীজীকে ditto দিয়া গেলেন। Ditto ত দিলেন, এখন এই wild-goose chase-এ যায় কে?

গবর্ণমেণ্ট ত উপবাসোপলক্ষে মহাত্মাজীকে জেল হইতে ছাড়িয়া দিলেন। তিনি ভাবিলেন যে অন্ততঃ তাঁহার নিজের একটা কিছু না করিলে আর মান থাকে না, সুতরাং তিনি গুটিকয়েক চেলা সমভিব্যাহারে যাত্রা করিলেন এবং রাস গ্রামে উপনীত হইলেন। কিন্তু মহাত্মার রাস-যাত্রা ঐ খানেই খতম হইল। তৎক্ষণাৎ সরকার তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিলেন এবং এক বৎসরের জন্য কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করিলেন। এবার কিন্তু কারা-গৃহে গিয়া মহাত্মাজী আর model prisoner থাকিতে রাজী হইলেন না। হরিজন-আন্দোলন জেলের ভিতর হইতেই তাঁহাকে পরিচালনার অনুমতি দিতে হইবে এই কোন্দল করিয়া আবার উপবাস করিলেন। গবর্ণমেণ্ট ভাবিলেন যে বেচারী নির্ব্বিষ হইয়াছে, ইহাকে ছাড়িয়া দেওয়া যাউক।

গান্ধী কারামুক্ত হইলেন এবং মুক্তি পাইয়াই কবুল করিলেন যে, এক বৎসরের মধ্যে রাজনীতির ছায়াও মাড়াইবেন না। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা আগষ্ট পর্য্যন্ত শুধু হরিজন-উদ্ধার করিবেন এবং তজ্জন্য পয়সা কুড়াইবেন; ৫ঠা আগষ্টের পর ভারত-উদ্ধারের বিষয় যাহা করিবার করিবেন। ততদিনে বোধ হয় হরিজন সব উদ্ধার হইয়া যাইবে, না গেলেও তাঁহার আন্দোলনের আর আবশ্যকতা থাকিবে না।

মহাত্মাজীর সব প্রোগ্রামই আধ্যাত্মিক কিনা, কাজেই ঠিক দেশ-কাল-সীমাবদ্ধ; একেবারে compartmental বন্দোবস্ত—ছোটখাট five-year plan আর কি; ঠিক যেন দৈনিক routine—ভোর ৬টা হইতে বেলা ৯টা পর্য্যন্ত পিতামাতার সম্মান করিব, ৯টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত সত্য কথা বলিব,

১২টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত পরোপকার করিব, এবং ৩টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত অহিংসার চর্চ্চা করিব। সাধারণ লোকের মনে হইতে পারে যে এরকম সময়-বিভাগ নির্দ্ধারণে রাজনীতি-চর্চ্চা প্রাণহীন কৃত্রিমতা মাত্র; যদি বাস্তবিকই কোন প্রচেষ্টা বা আন্দোলন দেশের উন্নতির পক্ষে আবশ্যক হয়, তবে তাহা ৪ঠা আগষ্টের পূর্ব্বেও যেমন আবশ্যক পরেও তেমনই আবশ্যক। কোন স্বাভাবিক আন্দোলনে time-limit থাকিতে পারে না। কিন্তু আধ্যাত্মিক পদ্ধতিই যে এই প্রকার, সাধারণ লোকে উহা বুঝিবে কি প্রকারে?

যাহা হউক, routine-মাফিক হরিজন-সফরে মহাত্মাজী বহির্গত হইলেন এবং হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সশব্দে সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন--পয়সাও কুড়াইতে লাগিলেন। সে পয়সা দ্বারা হরিজনদিগের ইস্কুল-কলেজ ব্যবসা-বাণিজ্য পসার-প্রতিপত্তির কতদূর সুবিধা হইয়াছে তাহা অবশ্য আজ পর্য্যন্ত অপ্রকাশ। ইতিমধ্যে উত্তর-ভারতে প্রকৃতির এক প্রলয়ঙ্কর তাণ্ডবলীলা প্রকটিত হইল— ভীষণ ভূকম্পে বিহার-প্রদেশ বিধ্বস্ত হইল—লোকে শিহরিয়া উঠিল এই ভয়াবহ দৃশ্যে। বিহারের সাহায্যার্থে লক্ষ লক্ষ টাকা বড়লাট হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষুদ্রতম ব্যক্তি পর্য্যন্ত প্রেরণ করিতে লাগিলেন—কিন্তু আর্ত্ত-বান্ধব মহাত্মাজী রহিলেন অচল অটল। তিনি এই তাণ্ডব-লীলায় ভগবানের অভিশাপ ও অমোঘ ন্যায়বিধান ও সমুচিত দণ্ড দেখিয়া পুলকিত হইলেন। কি জন্য অভিশাপ? কিসের দণ্ড? মহাত্মাজী ঘোষণা করিলেন, অস্পৃশ্যতা পাপের শাস্তি হিসাবে ভগবান্ এই দণ্ড দিয়াছেন। মহামানবের এই সূক্ষ্ম ধর্ম্মবুদ্ধি ও ন্যায়পরায়ণতা ও অন্তর্দৃষ্টি দেখিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ চমৎকৃত হইল। উপযুক্ত চেলারা আবার এই তত্ত্বের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা বাহির করিতে লাগিল। কিন্তু এত সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি বিশ্বকবিকে কিঞ্চিৎ বিচলিত করিল; তিনি এবিষয়ে মহাত্মাজীকে কিঞ্চিৎ অনুযোগ করিলেন। কিন্তু এই সব অনুযোগ গোলযোগে বিন্দুমাত্রও বিচলিত না হইয়া, যখন সমগ্র ভারত বিহারের সাহায্যার্থে অন্ন-বস্ত্র-অর্থদানে বিব্রত তখন মহাত্মাজী কিষ্কিন্ধ্যা

অঞ্চলে হরিজন ফণ্ডের পয়সা কুড়াইতে লাগিলেন। একেবারে চরম climax !

এদিকে কি mass কি individual কোন প্রকার civil disobedience-ই যখন আর নড়ে চড়ে না, তখন গান্ধীজীর চেলাদের মধ্যেও কিঞ্চিৎ politically-minded যাঁহারা তাঁহারা ভাবিলেন যে, soul-force-এর কল্যাণে দেশটা ত একেবারে freezing-point-এ গিয়া নামিল, অন্ততঃ কাউন্সিল প্রভৃতিতে প্রবেশের চেষ্টা করিয়া একটু চাঙ্গা করিলে মন্দ কি ? গান্ধীজীর নেতৃত্বের দৌলতে ভাবী শাসনতন্ত্রের ত দফা নিকাশ হইয়াছে, তবু নির্ব্বাচন প্রভৃতি লইয়া মাতামাতি করিলে দেশে একটু জীবনের সঞ্চার হইতে পারে। কিন্তু নিজেদের ত কোন কাজ করিবার সাহস নাই, কাজেই তাঁহারা গুরুজীর নিকট দৌড়াইলেন। এবার গুরুজী সহজেই রাজী হইলেন। উইলিংডনী ধাক্কা ত বড় কম নয়, ধাক্কার চোটে একেবারে "respectful co-operation" ! সুতরাং অবিলম্বে তিনি রাজী হইয়া বাণী ঘোষণা করিলেন, আমার মতবাদ ঠিকই আছে, কাউন্সিল প্রভৃতিতে আমি এখনও বিশ্বাস করি না, আগেও করি নাই (শুধু মনের ভুলে মন্দির-প্রবেশ বিলের সময়ে হঠাৎ বিশ্বাস করিয়া ফেলিয়াছিলাম এই যা) ; তবে তোমরা পার্লামেণ্টে ঢুকিতে চাও, বেশ ঢুকিয়া পড়, আমি তোমাদের বাধা দিব না, বরং সর্ব্বান্তঃকরণে তোমাদের সাফল্য কামনা করিব।

এই ফতোয়া পাইবার পর কংগ্রেসী দলবল, যাহারা কাউন্সিলে ঢুকিবার জন্য আঁকু পাকু করিতেছিল এবং গান্ধীজীর খপ্পরে পড়িয়া না ঢুকিতে পাইয়া গা কামড়াইয়া মরিতেছিল, তাহারা আজ স্বরাজ পার্টি কাল পার্লামেণ্টারী বোর্ড ইত্যাদির অবতারণা করিতে লাগিল। গান্ধীজীও তোবা তোবা করিয়া Civil Disobedience, কি mass, কি individual, সবই প্রত্যাহার করিয়া লইলেন। আর কংগ্রেসী চেলারা সরকার বাহাদুরকে অনুরোধ করিতে লাগিল, দোহাই হুজুর, আর আমাদের বে-আইনীর কোঠায়

ফেলিয়া রাখিবেন না, আমরা যে একেবারে good boy হইয়াছি। সরকার বাহাদুরও কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানগুলির উপর ban তুলিয়া লইলেন; এবং অবিলম্বে কংগ্রেসী ভ্রাতৃবৃন্দের মধ্যে অহিংসভাবে মাথা ফাটাফাটি সুরু হইয়া গেল।

কিন্তু অনেক ঢলাঢলির পর গান্ধী-মহাত্মা পুনরায় রাজনীতিক্ষেত্রে পদার্পণ করিয়া যে কাণ্ডটি করিয়া বসিলেন তাহা একেবারে অভাবনীয়। উঁহার যে মুসলমান-প্রীতি বা মুসলমান-আনুগত্য খিলাফৎ আন্দোলনে দেখা গিয়াছিল এবং যাহা মধ্যে মধ্যে blank cheque-এর মধ্য দিয়া ফুটিয়া বাহির হইত তাহাই আবার প্রকট হইয়া উঠিল। মহাত্মাজীর স্কন্ধে আন্‌সারী সাহেব ভর করিলেন এবং পশ্চাতে শৌকত আলি মিঞার বিশাল বপুও দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল, এবং ফল স্বরূপ এই হইল যে, যে Communal Award-এর নিন্দাবাদে গত দুই বৎসর যাবৎ ভারতের আকাশ-বাতাস মুখরিত হইতে ছিল, সেই Communal Award সম্বন্ধে মহাত্মাজী সিদ্ধান্ত করিলেন—neither to accept nor to reject, এবং একটি বিচিত্র-formula-সমন্বিত প্রস্তাব কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে তাঁহার চেলাদিগের দ্বারা পাস করাইয়া লইলেন যাহার casuistry-র নিকট Ignatius Loyola-র তীক্ষ্ণতম Jesuit শিষ্যও হার না মানিয়া যায় না।

কিন্তু জাতীয় জীবনের উচ্চতম স্বার্থ ও মহত্তম আদর্শের প্রতি গান্ধীর এই উদাসীনতা এবং এই ঘৃণ্য ভীরুতা এতদিনে দেশের মধ্যে একটা প্রবল প্রতিক্রিয়া আনয়ন করিল। এমন কি এতদিনকার গান্ধী-দাস কংগ্রেসী মহলেও ধৈর্যচ্যুতি ঘটিল। প্রবীণ হিন্দু নেতা পণ্ডিত মালবীয় এবং মহারাষ্ট্র-নেতা শ্রীযুক্ত আনে আর হজম করিতে পারিলেন না, এতদিনে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে বাধ্য হইলেন। কংগ্রেসের বাহিরে যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা ত বহুদিন হইতেই গান্ধীর অসংবদ্ধ কার্য্যকলাপ ও রাজনৈতিক কাণ্ডজ্ঞানহীনতা দেখিয়া disgusted হইয়া গিয়াছিলেন। দেশময় গান্ধী-রাজের প্রতি বিদ্রোহ প্রধূমিত হইতেছিল; আজ পণ্ডিত মালবীয়ের ন্যায়

একজন প্রবীণ নেতা পাইয়া সেই বিদ্রোহ প্রবল আকার ধারণ করিল; এবং এই বিদ্রোহের প্রতিক্রিয়াতেই আজ মহাত্মাজীর এই প্রকাণ্ড কৈফিয়ৎ ও কাঁদুনী।

তাই আজ তিনি হঠাৎ আবিষ্কার করিয়াছেন:

"A very large body of the Congress intelligentsia is tired of my methods and the views and the programme based upon them. I am a hindrance rather than a help to the natural growth of the Congress. Instead of remainning the most democratic and representative institution in the country, the Congress has degenerated into an organization dominated by my one personality and in it there is no free play of reason.

"I put the spinning wheel and *Khadi* in the fore-front. Hand-spinning by the Congress intelligentsia has all but disappeared. The general body of them have no faith in it."

আজ মহাত্মাজী হঠাৎ চিন্তার স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার আবশ্যকতার বিষয়ে সজাগ হইয়া উঠিয়াছেন এবং বলিতেছেন:

"Up to a point suppression of one's views in favour of those of another considered superior in wisdom or experience is virtuous and desirable for the healthy growth of an organization. It becomes a terrible oppression when one is called upon to repeat the performance from day to day."

আজ খোদ গুরুজীর মুখে স্বাধীন চিন্তার প্রশস্তি যেন কেমন কেমন শুনাইতেছে; যেন ভূতের মুখে রাম নাম। কিন্তু সহজে কি এই রাম নাম বাহির হইয়াছে? ঘটনার নির্ম্মম নিষ্পেষণে, stern logic of

facts-এর ধাক্কায় যখন ভূত ছাড়িবার উপক্রম হইয়াছে, তখনই এই রাম নাম আসিয়াছে।

কিন্তু dictatorship-এর অভ্যাস ত বড় সহজ নহে; সহসা এই অভ্যাস ছাড়া যায় না। তাই গুরুবাদের এই আসন্ন সময়েও মহাত্মাজী হাল ছাড়েন নাই—তিনি আর একবার শক্তি-পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইতে চাহেন, তিনি বড় কি তাঁহার প্রতিপক্ষ বড়। তাই তিনি সদম্ভে বলিয়াছেন,

"If they gain ascendency in the Congress, as they well may, I cannot remain in the Congress. For me to be in active opposition should be unthinkable. Though identified with many organizations during a long period of public service, I have never accepted that position."

অর্থাৎ কর্ত্তাভাবে প্রভুভাবে dictator-ভাবে ছাড়া কোন প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত থাকিতে তিনি প্রস্তুত নহেন।

তারপর তিনি বলিতেছেন, কংগ্রেসের প্রতিনিধি অনেক কমাইয়া দেও, ছয় হাজারের স্থলে এক হাজার কর, কারণ সংখ্যা কম হইলে প্রতিনিধিত্বের দাবী কিছু কম হয় না। এবং ইহার পরই democracy-র গান্ধীয় সংজ্ঞা প্রতিপাদন করিতেছেন:

"Nor is bulk a true test of democracy. True democracy is not inconsistent with a few persons representing the spirit, the hope and the aspirations of those whom they claim to represent. Western democracy is on its trial, if it has not already proved a failure. May it be reserved for India to evolve the true science of democracy by giving a visible demonstration of its success!"

চমৎকার! গণতন্ত্রের একেবারে হোমিওপ্যাথিক ব্যাখ্যা! পরিমাণ যত সূক্ষ্ম হইবে শক্তি তত প্রখর হইবে! তবে গান্ধীজী পাশ্চাত্য democracy-র প্রতি কিঞ্চিৎ অবিচার করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। প্রতিনিধি-সংখ্যা যত অল্প হয় ততই যদি ডেমক্রেসী প্রকৃত হয়, তবে সর্ব্বাপেক্ষা সাঁচ্চা ডেমক্রেসী পাওয়া যায় তখনই যখন প্রতিনিধি সংখ্যা হয় একমেবাদ্বিতীয়ম্। পাশ্চাত্য দেশে ত আজকাল এই রকম খাঁটি ডেমক্রেসীরই চর্চ্চা হইতেছে; উদাহরণ, হিট্‌লার, ষ্টালিন, মুসোলিনি; এবং সর্ব্বাপেক্ষা আদি ও অকৃত্রিম ডেমক্র্যাট ছিলেন ফরাসী সম্রাট চতুর্দ্দশ লুই, যিনি সগর্ব্বে বলিয়াছিলেন, *L'etat? c'est moi*। আশা করি আমাদের দেশের অহিংস আধ্যাত্মিক হিটলার মহোদয় অবিলম্বে শক্তির পরীক্ষায় জয়লাভ করিয়া প্রকৃত গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিবেন।

তাঁহার কৈফিয়তের সর্ব্বশেষে রাষ্ট্রনৈতিক ব্যর্থতার দায়িত্ব বেশ অম্লান-বদনে তাঁহার দুর্ভাগা চেলাদিগের উপর ফেলিয়াই তিনি খালাস হইবার চেষ্টা করিয়াছেন। যথা,

"No leader can give a good account of himself if his lead is not faithfully, ungrudgingly and intelligently followed."

এই আত্মদোষ ক্ষালনের প্রয়াসও তাঁহার কিছুই নূতন নহে। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের সেই বিখ্যাত ৩১শে ডিসেম্বরও যখন স্বরাজ আনিতে পারিল না, তখনও গুরুজী এই কথাই বলিয়াছিলেন. ওহে চেলাগণ, তোমরা কি আমার সব কথা শুনিয়াছিলে যে time মত স্বরাজ চাও? সুতরাং আমার হিমালয়ে যাইবার কোন কারণ নাই। অর্থাৎ বিশদ করিয়া বলিতে গেলে বলিতে হয়, কংগ্রেসের প্রত্যেক সভ্য যদি দুই হাজার গজ সূতা কাটিয়া সূতার পর্ব্বত প্রস্তুত করিতে পারিত এবং চব্বিশ ঘণ্টা আপাদমস্তক খদ্দরে মুড়িয়া থাকিত, এবং সদা সত্য কথা কহিত, এবং এক গালে চড় দিলে আর এক গাল ফিরাইয়া দিত, তাহা হইলে কবে ইংরাজের বন্দুক, কামান, বোমা, এরোপ্লেন,

রণতরী উড়িয়া যাইত, এবং ভারত-সীমান্তের পাঠানেরা ঘরে ঘরে চরকার মৃদু গুঞ্জনে ঘুমাইয়া পড়িত এবং কবে স্বরাজ্য আসিয়া এতদিনে পুরাতনও হইয়া যাইত। "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।"

দীর্ঘ চতুর্দ্দশ বৎসর কাল ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে যে আধ্যাত্মিক আন্দোলনের অভিনয় হইয়া গেল তাহার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল। বস্তুতঃ এ ইতিহাস যেন একটা বাস্তব জগতের ইতিহাস নহে—এ যেন একটা night-mare, একটা নিবিড় নিশীথের দুঃস্বপ্ন। ইহা ত কোন সুসংবদ্ধ ধারাবাহিক রাজনীতির ইতিহাস নহে ; একটি মাত্র অদ্ভুত ভাব-বাতিকগ্রস্ত খেয়ালী পুরুষের ব্যক্তিগত fitful জল্পনার হাসি-কান্নার নর্ত্তন-কুর্দ্দনের ইতিবৃত্ত। যে ব্যক্তিত্ব এইরূপ ভাবে একটা বিশাল দেশকে একটা বিপুল জাতিকে যাদুকরের ন্যায় নাচাইতে কাঁদাইতে পারে, সে ব্যক্তিত্বের অসাধারণত্ব অস্বীকার করিবার নহে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে এই রকম ক্ষেত্রে সেই ব্যক্তিত্ব যে পরিমাণে অসাধারণ হয়, জাতি ও দেশ সেই পরিমাণে পঙ্গু ও অবসন্ন হইয়া পড়ে ; দেশে স্বাধীন-চিন্তা লোপ পায়, বুদ্ধি-বিবেচনা অন্তর্হিত হয়, ক্রীড়া-পুত্তলের ন্যায় জাতি অসাড়ভাবে ইঙ্গিতে চলাফেরা করে। এই যে paralysis of judgment, এই যে চিন্তাশক্তির জড়তা, ইহাই জাতির চরমতম অধঃপতন। সাময়িক উত্তেজনা বা তথাকথিত জাগরণ ইহার ক্ষতিপূরণ করিতে পারে না—বস্তুতঃ সেই উত্তেজনা বা জাগরণের কোন স্থায়িত্ব বা বাস্তবতাই নাই, কারণ পর-মুহূর্ত্তেই পুনরায় অন্ধ অবসাদ আসিয়া জাতিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।

আর এই যে mass-awakening বা গণ-জাগরণ, যাহা মহাত্মা গান্ধী দেশে আনিয়া দিয়াছেন বলিয়া প্রায়শঃ শুনা যায়, ইহারও বিশেষ কোন অর্থ আমি খুঁজিয়া পাই না। সত্য কথা বলিতে কি, যাহাকে আমরা mass বা অশিক্ষিত জনসাধারণ বলি—তাহাদের মধ্যে রাজনৈতিক হিসাবে বিশেষ কোন জাগরণই হয় নাই। অবতার হিসাবে গান্ধী-মহাত্মার কৌপীনবন্ত মূর্ত্তি

দর্শনে পুণ্যার্জ্জন করিবার নিমিত্ত লক্ষ লক্ষ লোক সমবেত হইতে পারে, যেমন চিরকালই এদেশে তীর্থক্ষেত্র বা মহাপুরুষ দর্শনের নিমিত্ত জনসমাগম হইয়া থাকে ; কিন্তু তাহার মধ্যে রাজনৈতিক প্রেরণা কিছুমাত্র নাই। রাজনৈতিক প্রেরণার এক মাত্র ভিত্তি জনশিক্ষা, যদ্দ্বারা দেশ কি, রাষ্ট্র কি, ব্যবস্থা-পরিষদ্ কি, এবিষয়ে কতকটা জ্ঞান এবং ধারণা হওয়া সম্ভবপর। মন্ত্রদ্বারা রাজনৈতিক প্রেরণার সঞ্চার হয় না। আমাদের দেশে রাজনৈতিক প্রেরণা যদি কিছুমাত্র জাগিয়া থাকে তবে তাহা শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে—যাহাদিগকে বলা হয় intelligentsia,—এবং সেই রাজনৈতিক প্রেরণা ও জাতীয় স্বাধীনতার নিমিত্ত আকাঙ্ক্ষা ভারতের রাজনীতি-ক্ষেত্রে গান্ধীর আবির্ভাবের অনেক পূর্ব্বেই দেশে সঞ্চারিত হইয়াছিল।

ব্যাপকভাবে গভীর ভাবে রাষ্ট্রীয় প্রেরণা এদেশে প্রথম সঞ্চারিত হয় বিখ্যাত স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে। বঙ্গদেশে উত্থিত সেই আন্দোলনের তরঙ্গ ক্রমশঃ ভারতময় প্রসারিত হয়—সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র, অরবিন্দ, তিলক, লাজপত রায়ের আপ্রাণ চেষ্টায়। তারপর, যেমন হইয়া থাকে, ঘটনার পর ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে, গবর্ণমেণ্টের রুদ্র-নীতিতে, মহাযুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায়, শিক্ষিত দেশবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপনা ক্রমশঃই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে। এই রকমই একটা আন্দোলনের তরঙ্গে গান্ধী পড়িয়া যান এবং নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

অসহযোগ বা আইন-অমান্য আন্দোলনে শিক্ষিত সমাজে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা যে আরও ব্যাপকতর হয় নাই, একথা আমার বলিবার উদ্দেশ্য নহে। আমার বক্তব্য এই যে, যে কোন দেশব্যাপী আন্দোলনেই এরূপ চেতনার ও উৎসাহের প্রসার হইয়া থাকে। সেই প্রসার ঠিক আন্দোলনের খুঁটিনাটি বা প্রণালী বা পদ্ধতির উপর নির্ভর করে না। পদ্ধতি যাহাই হউক না কেন, যদি আন্দোলনের পশ্চাতে উৎসাহ থাকে, উদ্দীপনা থাকে, আন্তরিকতা থাকে, spirit of resistance

থাকে, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা থাকে, তবেই বহুল পরিমাণে চেতনার সঞ্চার বা জাগরণ হইয়া থাকে।

দৃষ্টান্ত সহজেই দেওয়া যায়। আমরা বাঙ্গালার কথাই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বলিতে পারি। স্বদেশী আন্দোলনে জাতীয় চেতনার যে স্ফূর্ত্তি যে বিকাশ যে উদ্দীপনা হইয়াছিল, বাঙ্গালাদেশে তাহার শতাংশের একাংশও অসহযোগ আন্দোলনে হইয়াছিল কিনা সন্দেহ। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনে কাউন্সিল-বর্জ্জন ছিল না, চরকা-খদ্দরের fetish ছিল না, philosophy of the bullock-cart ছিল না, অহিংস অধ্যাত্মিকতার বাড়াবাড়ি ছিল না, উপবাসের আড়ম্বর ছিল না। সে আন্দোলন অত্যন্ত modern এবং democratic ভাবাপন্ন ছিল; কিন্তু তন্নিমিত্ত উহার প্রভাব কিছুমাত্র কম হয় নাই। তারপর, অসহযোগের ব্যর্থতার পর, বাঙ্গালার চিত্তরঞ্জন যখন স্বরাজ্যদল গঠন করিয়া কাউন্সিলে গিয়া সরকারের সহিত লড়াই করিতে লাগিলেন, তাহাতেও কিছু কম উদ্দীপনার সঞ্চার হয় নাই। এবং স্যার আশুতোষ বা স্যার সুরেন্দ্রনাথের মত একেবারে গবর্ণমেণ্টের মধ্যে ঢুকিয়া শাসনযন্ত্র করায়ত্ত করিয়া যদি জাতীয় উন্নতির সাধনা একাগ্রচিত্তে করা যাইত তাহাতেও উদ্দীপনা ও জাগরণ কিছু কম হইত না। কয়েকদিন মাত্র কেন্দ্রীয় পরিষদের সভাপতিরূপে স্বর্গীয় বিঠলভাই প্যাটেলের কার্য্যকলাপই তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয়। সুতরাং মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় একাগ্র এবং প্রভাবান্বিত নেতা কর্ত্তৃক পরিচালিত আন্দোলনে শিক্ষিত সমাজে রাজনৈতিক জাগরণ কতকটা অগ্রসর হইয়াছে ইহাতে কিছুমাত্র বিস্ময়ের বিষয় নাই। কিন্তু ইহাতে তাঁহার অবলম্বিত "নেতি নেতি" পদ্ধতির বিশেষ কোন কৃতিত্ব নাই।

পরন্তু গান্ধী-পরিচালিত আন্দোলনে যে বিষম রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা, দেশকালপাত্র সম্বন্ধে যে আশ্চর্য্য অবিবেচনা ও অন্ধতা, এবং যে অদ্ভুত ব্যক্তিগত খেয়ালপ্রিয়তা ও তাহার অন্ধ অনুসরণ দেখা গিয়াছে, তাহা দেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎকে একেবারে গাঢ়তমসাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে।

একটা কথা মাঝে মাঝে শুনিতে পাই যে গান্ধী একজন saint অথবা মহাত্মা ব্যক্তি, তাঁহার আদর্শ অতি উচ্চাঙ্গের, তিনি যে সব অতি আধ্যাত্মিক পন্থা দেশবাসীকে দেখাইয়া দেন, তাহা সামান্য মর্ত্ত্য মানব বলিয়া তাহারা ধরিতে পারে না, আয়ত্ত করিতে পারে না, তাইত গান্ধী কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না। এই কথা বারংবার পুনরুক্ত হওয়াতে বোধ করি উঁহার নিজের মনেও ঐরূপ একটা ধারণা বা conceit বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এই আধ্যাত্মিকতা ও উচ্চ আদর্শের দোহাই আমি ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

একটা জাতির—পরাধীন জাতির—আত্ম-কর্তৃত্ব-প্রতিষ্ঠা বা স্বরাজ-লাভ যতই কঠিন ও জটিল হউক, ইহার মধ্যে mystic কিছুই নাই। ইহা কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করিয়া মূলাধার হইতে ষট্‌চক্র ভেদপূর্ব্বক সহস্রারে লইয়া যাইবার মত দুর্ব্বোধ্য তান্ত্রিক সাধনা নহে যে পদে পদে সদ্‌গুরুর গুপ্ত মন্ত্রের শরণ লওয়া ব্যতীত আর উপায়ান্তর নাই। রাজনৈতিক সাধনা অত্যন্ত secular পার্থিব ব্যাপার; ইহার মধ্যে আর যাহাই থাকুক, mystery কিছু নাই। তাছাড়া, চরকার দ্বারা সূতা কাটার মধ্যে কিংবা habitually খদ্দর পরিধানের মধ্যে আধ্যাত্মিকতার কোন গন্ধ শুঁকিয়া পাওয়া যায় না; অথবা সাগরতীরে লবণ জাল দিবার মধ্যেও ধর্ম্মের কোন গূঢ়তত্ত্ব লুকাইয়া নাই। এমন কি, কাউন্সিল বয়কট করিলে যে স্বর্গে উর্ব্বশী-মেনকার নৃত্য-সভায় box reserved হইয়া থাকিবে, এবং মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিলে যে কুম্ভীপাক রৌরব নরকে ভর্জ্জিত ও সিদ্ধ হইতে হইবে ইহা কোন শাস্ত্রে লেখা নাই; স্বয়ং গান্ধীজীর গীতা-ভাষ্যেও এমন কথা লেখে না। তাছাড়া, চিত্ত-শুদ্ধির জন্য, বিধাতার সহিত communion-এর নিমিত্ত যে উপবাস, তাহা অজস্র ঢক্কা-নিনাদ ও বিজ্ঞাপনের আড়ম্বর সহ ঘোষণা করায় কিরূপ আধ্যাত্মিকতা তাহাও ত বুঝিতে পারি না। তবে অহরহঃ এই আধ্যাত্মিকতার উৎপাত কেন? যেন যাহারা গান্ধীজীর রাজনৈতিক মতবাদকে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এবং কর্ম্মধারাকে সম্পূর্ণ বিপথগামী মনে করে তাহারা নেহাৎই

"কেষ্টের জীব" বা আধুনিক ভাষায় "হরিজন"। বস্তুতঃ রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক অহমিকা একেবারেই হাস্যাস্পদ।

দেশ রাষ্ট্রনেতারূপে একদা গান্ধীকে গ্রহণ করিয়াছিল দেশের জাতীয় স্বাধীনতা অর্জ্জন করিবার জন্য; তাঁহার ব্যক্তিগত experiments with truth অথবা freaks-এর জন্য নহে; তাঁহার দৈহিক নৈতিক ও পারিবারিক নানাবিধ তাত্ত্বিক fads-এর জন্যও নহে। সুতরাং তাঁহার রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদ ও কর্ম্মপন্থা কতটা পরিমাণে আসল উদ্দেশ্যের অর্থাৎ রাজনৈতিক উন্নতির সহায়ক হইয়াছে বা হয় নাই, তাহাই একমাত্র বিবেচ্য বিষয়। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক কচ্‌কচি, অহিংসা কত ডিগ্রি বজায় রহিল বা ক্ষুণ্ণ হইল, "কায়েন মনসা বাচা" সম্পূর্ণ শুদ্ধি হইল কিনা, soul-force দ্বারা change of heart হয় কি না, কত পরিমাণ পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ কতদিনব্যাপী উপবাস বিধেয়—এই সব নয়া রঘুনন্দনী আলোচনা নিতান্তই অবান্তর এবং অপ্রাসঙ্গিক। রাজনীতির ক্ষেত্রেও যে এই প্রকার চুলচেরা নৈয়ায়িক বিশ্লেষণ ও Jesuitical casuistry গম্ভীরভাবে চলিতে পারে ইহা স্বচক্ষে না দেখিলে কেহ বিশ্বাস করিতে পারিত না। এই তথাকথিত আধ্যাত্মিকতা, যাহা অন্ধ মূঢ় তামসিকতারই নামান্তর মাত্র, ইহার আবেশ এমনই ভাবে এখনও পর্য্যন্ত জাতির চিত্তকে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছে যে সহজ জিনিষকেও সোজাভাবে দেখিবার অভ্যাস পর্য্যন্ত আমাদের নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

অথচ আমাদের সমক্ষে যে রাজনৈতিক সমস্যা উপস্থিত তাহা হৃদয়ঙ্গম করা কিছুমাত্র শক্ত নহে। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় রাষ্ট্রীয় স্বরাজ অর্জ্জন করা দুরূহ হইতে পারে, কিন্তু সেই বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে কোন অস্পষ্টতা বা mystery-র অবকাশ নাই। যে কেহ আমাদের দেশের ও ইংলণ্ডের ইতিহাসের সহিত কিঞ্চিন্মাত্র পরিচিত আছেন, তিনিই সমস্যাটির সম্যক্ ধারণা করিতে পারেন।

বিভিন্ন ভাষা-ভাষী, বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী, বিভিন্ন জাতির আবাসস্থল এই ভারতবর্ষ—একটা মহাদেশ বলিলেই হয়—আজ শতাধিক বর্ষকাল পাশ্চাত্য এক প্রবল শক্তির রাজত্বের অধীনে আসিয়াছে। সেই প্রবল রাজশক্তির এক-চ্ছত্র অপ্রতিহত শাসনে ও ইংরাজী ভাষার বহুল প্রচারে ভারতের বিভিন্ন-দেশীয় ব্যক্তিগণের মধ্য চিন্তার আদান-প্রদান সহজ হওয়াতে একটা এক-জাতীয়ত্ববোধ ভারতময় কতকটা সঞ্চারিত হইয়াছে। সম্পূর্ণভাবে হয় নাই কারণ, হিন্দু-মুসলমানের স্বাতন্ত্র্য বোধ, প্রদেশে প্রদেশে স্বাতন্ত্র্যবোধ, এমন কি ঈর্ষ্যাদ্বেষ, যথেষ্টই আছে, তবে কতকটা জাতীয়তাবোধ বৈদেশিক শাসনে সঞ্জাত হইয়াছে। তাছাড়া, পাশ্চাত্য সাহিত্য ও ইতিহাসের প্রভাবে দেশে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ক্রমশঃই অধিকমাত্রাতে জাগরিত হইয়াছে। সর্ব্বোপরি, বিংশ শতাব্দীতে এশিয়ার নব-জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে ভারতেও আত্মপ্রত্যয় ও আত্মপ্রতিষ্ঠার ভাব খুব দ্রুত অগ্রসর হইয়াছে। আর সিপাহী-বিদ্রোহের পর *Pax Britannica*-র দৌলতে শিক্ষা, ব্যবসায় ও বাণিজ্যেও দেশ অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। সুতরাং যে স্বেচ্ছাতন্ত্র শাসন-প্রণালী প্রায় গোটা ঊনবিংশ শতাব্দী ধরিয়া ভারতে প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহাতে শিক্ষিত জনসাধারণ আর সন্তুষ্ট থাকিতে পারে নাই। শাসনযন্ত্রে দেশীয় লোকের অধিকতর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার জন্য তাহারা আন্দোলন করিতে থাকে।

ইংরাজেরও রাজনৈতিক বিচক্ষণতা কিছু কম নয়। প্রায় দেড়শত বৎসর বিশাল সাম্রাজ্য শাসন করিয়া তাহাদের একটা political commonsense জন্মিয়াছে—কখন্ আন্দোলনে concession করা আবশ্যক এই বিষয়ে। তাই শিক্ষিত ভারতবাসিগণের এই যে রাষ্ট্রীয়-সংস্কার আন্দোলন—যাহা পরিচালনা করিবার জন্য সুরেন্দ্রনাথ-প্রমুখ দূরদর্শী নেতাদিগের দ্বারা কংগ্রেসের সৃষ্টি হইয়াছিল—সেই আন্দোলনের ফলে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে প্রথম শাসন-সংস্কার হইল। ইহারই নাম Lord Cross's Act। পরে স্বদেশী আন্দোলনের ফলে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে হইল আর এক দফা শাসন-সংস্কার; ইহার নাম Morley-

Minto Reforms। মহাযুদ্ধের ফলে আর এক প্রস্থ শাসন-সংস্কার হইল ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ; ইহাই Montagu-Chelmsford Reforms, যাহা এখনও পর্য্যন্ত চলিতেছে। ইহারই অব্যবহিত পরে ভারতকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য প্রায় সমস্ত রাজবন্দীকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল এবং প্রেস-আইন প্রভৃতি দমন-নীতিমূলক প্রায় সমস্ত আইন তুলিয়া লওয়া হইল।

কিন্তু তখনই আরম্ভ হইল গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন। অথচ এই আন্দোলনের সহিত মণ্টেগু-সংস্কারের কোন সম্পর্ক ছিল না ; সম্পূর্ণ আকস্মিক ও অবান্তর পঞ্জাবের গোলযোগ-ঘটিত ব্যাপার লইয়া ইহার উৎপত্তি ; কিন্তু ইহার ধাক্কা গিয়া পড়িল নূতন শাসন-সংস্কারের উপর। গান্ধীজী ইংরাজের উপর গোঁসা হইয়া বলিলেন, আমরা Reforms work করিব না, কাউন্সিলে যাইব না। ইহাতে ইংরাজ সরকারের বিন্দুমাত্র ক্ষতি হইল না, পরন্তু তাহাদের কার্য্যকলাপ আরও smoothly চলিতে লাগিল। চোরের উপর রাগ করিয়া মাটিতে ভাত খাওয়া আর কি ? নূতন শাসন-বিধি অনুসারে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়া দেশের যে উন্নতি করা যাইত—সুরেন্দ্রনাথ যাহার পথ দেখাইয়া ছিলেন—তাহার সম্ভাবনা সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া গেল ; constructive দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে এই চৌদ্দটা বৎসর একেবারে মাটি।

তাছাড়া, মুসলমানদিগকে দলে টানিবার জন্য সম্পূর্ণ অ-ভারতীয় অবান্তর খিলাফতী আন্দোলনে গান্ধী যোগদান করিয়া মোল্লা-মৌলবীগণের দ্বারা অন্ধ ধর্ম্মান্ধতা দেশময় ছড়াইয়া দিলেন ; তাহার ফলে হইল মোপলা-বিদ্রোহ ও কোহাটের তাণ্ডবলীলা ও সারা ভারতময় হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা। দেশময় রক্ত-গঙ্গা বহিল। গান্ধী তিন সপ্তাহ উপবাস করিয়া এই পাপের প্রায়শ্চিত্তের প্রয়াস করিলেন।

তারপর, যখন চিত্তরঞ্জন অনেক চেষ্টার পর গান্ধীর প্রভাব হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া শেষ অবধি কাউন্সিলে গেলেন, তখন তিনি Dyarchy-বধের ধান্দায় পড়িলেন। পড়িয়া করিলেন Hindu-Muslim Pact—যাহাতে তিনি

অঙ্গীকার করিলেন, বাঙ্গালা দেশে জনসংখ্যার অনুপাত অনুসারে কাউন্সিলে শতকরা ৫৫টি seat মুসলমানেরা পাইবে—স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচন-মূলে। এত সংখ্যক seat বর্ত্তমান Communal Award-এও তাহারা পায় নাই। চিত্তরঞ্জনের ভক্তদল কোন্ মুখে আজ Award-কে আক্রমণ করে বুঝি না। এই প্যাক্টের প্রতিক্রিয়ায় কলিকাতা, পাবনা, ঢাকা ও চট্টগ্রাম হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায় বিধ্বস্ত হইয়া গেল।

এদিকে যখন এই অবস্থা তখন ওদিকে মণ্টেগু-রিফর্ম্মের দশ-সালা revision-এর সময় ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। যাহাতে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে নূতন শাসন-সংস্কার বিধিবদ্ধ হইতে পারে, সেইজন্য ভারত-সচিব লর্ড বার্কেনহেড এক বৎসর আগেই সাইমন সাহেবের সভাপতিত্বে ষ্ট্যাটুটরী কমিশন ভারতবর্ষে পাঠাইলেন। কমিশনে ভারতীয় কোন সদস্য নাই এই অভিমানে হিন্দু নেতারা, কংগ্রেসী ও মডারেট উভয়েই, কমিশন করিলেন বয়কট। কিন্তু মুসলমান নেতারা—যাঁহারা রাজনীতিতে realism -এর আবশ্যকতা উপলব্ধি করেন—তাঁহারা বয়কট করিলেন না। তৎসত্ত্বেও সাইমন কমিশনের রিপোর্ট মোটামুটিভাবে বেশ progressive ও সন্তোষজনকই হইয়াছিল; কিন্তু তাহাও হিন্দু নেতারা করিলেন reject।

শান্তিকামী লর্ড আরুইন কংগ্রেস-চালিত হিন্দুকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য স্বয়ং বিলাত গিয়া গোল-টেবিল বৈঠকের বন্দোবস্ত করিয়া আসিলেন এবং Dominion Status-এর আশ্বাস আনিলেন। তাহার উত্তরে গান্ধীর দল ঘোষণা করিলেন পূর্ণ স্বরাজ ও আরম্ভ করিলেন আইন-অমান্য। এবারকার এই "যুদ্ধং দেহি" ঘোষণা করিবার বিন্দুমাত্র moral justification ছিল না, political wisdom ত ছিলই না; কারণ ইংরাজের কোন reactionary measure-এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ এই আন্দোলনের জন্ম হয় নাই; পরন্তু তদানীন্তন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট নিরতিশয় শান্তিপ্রয়াসী ছিল —র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড তখন প্রধান মন্ত্রী, ওয়েজউড বেন

লর্ড আরুইন বড় লাট। গান্ধী-চালিত কংগ্রেসের মাত্রাহীন অহমিকা হইতেই ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের এই সম্পূর্ণ অহেতুক gratuitous আইন অমান্য আন্দোলনের জন্ম। সুতরাং শক্তিহীনের আস্ফালন ও অহমিকার যাহা পরিণতি, ইহারও সেই পরিণতিই হইল। যে সমস্ত repressive laws দশ বৎসর পূর্ব্বে লর্ড রেডিংএর আমলে প্রায় সব উঠিয়া গিয়াছিল তাহারই পুনঃ প্রবর্ত্তন হইল, এবং ইহারই সাহায্যে লর্ড উইলিংডনের গবর্ণমেণ্টের রুদ্রশাসনে এই বাক্‌সর্ব্বস্ব আন্দোলন নিষ্পেষিত হইয়া গেল।

কোন concession কোন ন্যায়সঙ্গত আপোষে যখন রাজনৈতিক হিন্দু নেতারা সন্তুষ্ট হইবার নহেন, পরন্তু তাহাদের দাবী-দাওয়া বাড়িয়াই চলিতে লাগিল, তখন ইংরাজ স্থির করিল যে হিন্দু ব্যতীতও এই বিশাল হিন্দুস্থানে মুসলমান-প্রমুখ আরও যে বহু জাতি বাস করে এবং যে বহু-সংখ্যক দেশীয় রাষ্ট্র রহিয়াছে, তাহাদের সাহায্যে রাজনৈতিক হিন্দুকে জব্দ ও কোণ-ঠেসা করিয়া রাখাই সমীচীন। তাই তাহারা White Paper-এ Federation-এর পরিকল্পনা করিল এবং সেই পরিকল্পনাও Communal Award-এর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিল। যে Federal Assembly-তে সাইমন রিপোর্ট অনুসারে ২৫০র ভিতরে ১৫০টিই নির্ব্বাচিত হিন্দুর seat ছিল, সেই Assembly-তে Award অনুসারে ৩৭৫ এর ভিতরে মোট ১০৫টি নির্ব্বাচিত হিন্দুর seat (তন্মধ্যে আবার গান্ধীর পুণা-চুক্তির দৌলতে ১৯টা হরিজনদের জন্য বরাদ্দ হইয়াছে), বাকী seat গুলির মধ্যে ১২৫ জন দেশীয় রাজন্যবৃন্দের প্রতিনিধি (যাহারা ইংরাজের হস্তে ক্রীড়াপুত্তল মাত্র), আর ৮২ জন মুসলমান, এবং বাকী সব ইউরোপীয় ও ইউরেশীয়, ইত্যাদি। অথচ ভারতবর্ষের তিন-চতুর্থাংশ লোক হিন্দু। বাঙ্গালা দেশের কথা ত তোলাই নিষ্প্রয়োজন।

এই Communal Award হিন্দু নেতৃত্বের অদূরদর্শিতা ও অন্ধ ব্রিটিশ বিদ্বেষের অবশ্যম্ভাবী ফল, চতুর্দ্দশ বৎসরের গান্ধী-আন্দোলনের

অপ্রতিবিধেয় প্রতিক্রিয়া। একদিনের মতিভ্রমে ইহা হয় নাই এবং একদিনের প্রায়শ্চিত্তে ইহা যাইবারও কোন সম্ভাবনা নাই।

অথচ একথা বলিলে মিথ্যা বলা হইবে যে ভারতের আধুনিক ইতিহাসে, অন্ততঃ বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে, ইংরাজ reasonable compromise-এ কখনও গররাজী হইয়াছে। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে লর্ড রেডিংএর আপোষ মীমাংসার প্রস্তাব—যাহা গান্ধী প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন—এবং ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের Irwin-Gandhi Pact ইহার সুস্পষ্ট উদাহরণ। কিন্তু তা' বলিয়া এমনও কিছু বিষম বিপদে ইংরাজ পড়ে নাই ভারতবর্ষে, এমন কোন ওয়াটালু কিংবা পাণিপথে তাহারা পরাজিত হয় নাই গান্ধী-চমূর নিকটে, যে peace at any price ছাড়া তাহাদের গত্যন্তর নাই। যদি গান্ধী বা তাঁহার অনুচরগণ এইরূপ ভাবিয়া থাকেন তবে তাঁহারা Himalayan blunder-ই করিয়াছেন, এবং সেই blunder এবং miscalculation-এর ফল আজ দেশময় প্রকট। গবর্ণমেণ্টের এরূপ শক্তিদৃপ্ততা ও দেশের জনসাধারণের এতাদৃশ নৈরাশ্য অবসাদ ও demoralisation বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভের পর ভারতবর্ষে আর ঘটিয়াছে কিনা সন্দেহ।

ইহাতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে রাজনীতি পরিচালনে প্রয়োজন হয় আধ্যাত্মিক বুজরুকী নয়, প্রায়শ্চিত্তের বাড়াবাড়ি নয়—আবশ্যক হয় রাজনৈতিক কাণ্ডজ্ঞান, আবশ্যক হয় sense of realities। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে বিপথ-চালিত আন্দোলনের ফলে দেশের এত বড় অনিষ্ট সংসাধিত হইল, সেই কংগ্রেসী আন্দোলনের নেতাদিগের মধ্যে তন্নিবন্ধন কোন লজ্জা বা অনুশোচনার চিহ্ন মাত্র নাই। অদ্ভুত brass বটে! ১৯২১ খৃষ্টাব্দে বরিশালে মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল যে বলিয়াছিলেন, বাহুবল যাহাদের আয়ত্তের মধ্যে নাই, নৈতিক বল বা moral pressure-ই যাহাদের এক মাত্র অস্ত্র, তাহাদের পক্ষে *Swaraj* can only come by compromise and consultation, আজ সেই কথা

জাতির হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি হইতেছে। তবে ভারতের দুর্ভাগ্য—সমস্তই too late!

আজ দেশের মধ্যে গান্ধীর অন্ধ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ধূমায়িত হইতেছে; এই বিদ্রোহ যদি ১৯২১-এ হইত, ১৯২৮-এ হইত, এমন কি ১৯৩০-এ হইত, তবে Award-সংবলিত White Paper-এর চাপে আজ এমন ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতে হইত না; ভারতের ইতিহাস আজ অন্য আকার ধারণ করিত। এ বিষয়ে শুধু গান্ধীকে অপরাধী করিলে অবিচার করা হয়। যাঁহারা মনে মনে অন্য মত পোষণ করিয়াও কার্য্যতঃ গান্ধীর দাসত্বই করিয়াছেন তাঁহাদের দায়িত্ব ও অপরাধ আরও গুরুতর।

আজ যখন সমস্ত নূতন শাসনতন্ত্র একরূপ প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে, বিকৃত হইয়া গিয়াছে, বিজাতীয় আকার ধারণ করিয়াছে, আজ বাদে কাল পার্লামেণ্টে বিধিবদ্ধ হইতে চলিয়াছে, তখন আর করিবার কি আছে? যখন করিবার সময় ছিল, যখন fluid formative stage ছিল, তখন সব গান্ধী-মোহে তন্দ্রাচ্ছন্ন। এখন, যখন সব শেষ, তখন ছটফট করিলে কি হইবে? রোগীর জীবন-দীপ যখন নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছে তখন স্বয়ং ধন্বন্তরিই বা কি করিতে পারেন? দেশের দুর্ভাগ্য, তাই সহস্র সুবিধা সুযোগ সামর্থ্য সত্ত্বেও ভারতের জাতীয় জীবন আজ মূর্চ্ছাপন্ন, ভারতের ভাগ্যাকাশ আজ ঘন-ঘোরঘটাচ্ছন্ন। চতুর্দ্দশ বৎসরের ইহাই সাল-তামামি; ইহারই সংক্ষিপ্ত চুম্বক গান্ধীজীর আজিকার এই মর্ম্মভেদী epitaph। নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে?

আশ্বিন, ১৩৪১।

তত্ত্ব কি ?

ততঃ কিম্ ?

সে আজ প্রায় মাস দেড়েকের কথা। পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় অনেক ভাবিবার চিন্তিবার পর সবে তখন Communal Award বা সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত উপলক্ষ্য করিয়া মহাত্মা গান্ধীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সুরু করিয়াছেন এবং Nationalist Party বা জাতীয়-দল গঠনে মনোনিবেশ করিয়াছেন। এই সময়ে একদিন শ্রদ্ধাভাজন ব্যারিষ্টার-প্রবর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ।

জানি না, আজকালকার যুবকবৃন্দের কাছে চৌধুরী মহাশয়ের নাম পরিজ্ঞাত আছে কিনা। না থাকিলেও কিছুই আশ্চর্য্য হইব না, কারণ জনসাধারণের স্মৃতি অতি ক্ষণস্থায়ী; পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বেকার বিখ্যাত স্বদেশী আন্দোলনও এখনকার ছেলেদের কাছে একটা জনশ্রুতিমাত্র। A generation that knows not Joseph আজ আমাদের সাম্‌নে উদীয়মান। আর শুধু ছেলেদের দোষ দিলেই বা কি হইবে? ইতিহাসের বালাই

ত আমাদের নাই ; সুতরাং স্বদেশী আন্দোলন বাঙ্গালার বুকে কি প্রেরণা, কি উদ্দীপনার সঞ্চার করিয়াছিল, বাঙ্গালার প্রাণে কি পুলক-ঝঙ্কারই তুলিয়াছিল, তাহা তাহারা জানিবে কি প্রকারে ? তাই অনেকেরই ধারণা যে গান্ধী-যুগের পূর্ব্বে দেশে রাজনীতি ছিল না, দেশভক্তি ছিল না—গুজরাট হইতে জাতীয় জাগরণ আজই নয়া আমদানী হইয়াছে। যাহা হউক, সেই স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম প্রধান কর্ম্মী ছিলেন চৌধুরী মহাশয়, এবং তারপর তিনি নানাভাবে নানাস্থানে, দেশীয়-শিল্প-প্রতিষ্ঠানে, ব্যবস্থা-পরিষদে, নিজের জ্ঞানশক্তি-অনুযায়ী দেশের সেবা করিয়া আসিতেছেন, এবং আজ প্রায় পঁচাত্তর বৎসর বয়ঃক্রম সত্ত্বেও অদম্য উৎসাহে বাঙ্গালার প্রাচীন লবণ তৈয়ারীর ব্যবসায় পুনঃসঞ্জীবিত করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন।

চৌধুরী মহাশয়কে আমি বলিলাম,

"মালবীয়জী ত এত দিন পরে বিদ্রোহ করিলেন। ফলাফল কি হইবে মনে করেন ?"

বিষাদের হাসি হাসিয়া চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,

"বিদ্রোহ করিয়াছেন ভালই করিয়াছেন—better late than never ! এতদিন ভয়ে ভয়েই হউক, সস্তায় লোকসম্মান পাইবার খাতিরেই হউক, বা গান্ধীর প্রতি অহেতুকী অচলা ভক্তিবশতঃই হউক, রাজনীতিতে সমাজনীতিতে গান্ধীর নিকট বিনাবাক্যব্যয়ে আত্ম-সমর্পণ করিয়া, অন্ততঃ আজ যে মালবীয় মেরুদণ্ড কতকটা খাড়া করিতে পারিয়াছেন ইহাই আনন্দের বিষয়। কিন্তু আজ যে একেবারে—too late ! যখন মানুষের মত বীরের মত গান্ধী-নেতৃত্বের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলে কাজ হইত তখনই রহিলেন চুপ করিয়া। সুযোগের পর সুযোগ দেশের সম্মুখ দিয়া বহিয়া চলিয়া গেল। দেশের শাসন-যন্ত্র জাতীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিবার যে প্রচেষ্টা ১৯২০ খৃষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি করিয়াছিলেন, ইঁহাদের মত লোক যদি সেই প্রচেষ্টায় মনঃপ্রাণে যোগ দিতেন, তবে কি আর দেশের

এই অবস্থা হয়? নূতন শাসন-সংস্কার হইল; দেশবাসীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য রাজবন্দীদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল; দমনমূলক আইনও প্রায় সকল-গুলিই রদ করা হইল—আমি নিজে তখন ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সেই Repressive Laws Committee-তে ছিলাম—সে ১৯২২এর কথা। লর্ড রেডিংএর আমলে দেশে শান্তি আনিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটী হইল না; যুবরাজের আগমন উপলক্ষ্যে লর্ড রেডিং গোল-টেবিল বৈঠক পর্য্যন্ত প্রস্তাব করিলেন; কিন্তু গান্ধীর একগুঁয়েমিতে সব নষ্ট হইয়া গেল। সেই নব শাসন-সংস্কারের সময়ে হিন্দুদিগের প্রতিপত্তি কত? হিন্দু-পরিচালিত স্বদেশী আন্দোলনে বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ রদ হইয়া গেল, মর্লি-মিণ্টো শাসন-সংস্কার হইল। হিন্দুদেরই Home Rule Movement-এর ফলে মহাযুদ্ধের মধ্যেই মণ্টেগু সাহেবের বিখ্যাত ঘোষণা হইল; হিন্দু নেতা সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ লর্ড হইলেন, সহকারী ভারত-সচিব হইলেন, পরে বিহারের গভর্ণর হইয়া আসিলেন; বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, বিচক্ষণতায়, প্রভাবে, প্রতিপত্তিতে তখন হিন্দুই সর্ব্বত্র অগ্রণী; মুসলমানেরা হিন্দুদের দেখাদেখি সবে রাজনৈতিক আন্দোলন ও সভাসমিতি প্রভৃতি করিতে সুরু করিয়াছে; কাজেই দেশে মণ্টেগু শাসন-সংস্কারের প্রাক্কালে হিন্দুদের গৌরব কত? আর হিন্দুরাই ত এদেশে বাস্তবিক জাতীয়ভাবের ভাবুক—সাম্প্রদায়িকতার নামগন্ধও তাহাদের মধ্যে ছিল না—এখন নেহাৎ আত্মরক্ষার গতিকে কতকটা হয় ত জাগিয়া উঠিয়া থাকিবে। সেই জাতীয়তার মন্ত্রে দীক্ষিত হিন্দুনেতৃগণের সমক্ষে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে দেশসেবার, দেশের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি গঠন করিবার, কতবড় সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল! হইতে পারে, মণ্টেগু-সংস্কারে ক্ষমতা পরিমিত বা সীমাবদ্ধ ছিল; কিন্তু সেই পরিমিত সীমার মধ্যেও যে কতখানি কাজ করা যায়, যদি দেশভক্ত তেজস্বী লোক শাসনযন্ত্র পরিচালনা করে, তাহার দৃষ্টান্ত দিতে আর অধিক দূর যাইতে হইবে না—সুরেন্দ্রনাথের Calcutta Municipal Act-ই তাহার জলন্ত উদাহরণ। আজ যে বাঙ্গালায় কংগ্রেসীদের

এত প্রতিপত্তি, ইহা ত এই মিউনিসিপাল আইনের কল্যাণেই। আমরা শুধু যন্ত্রের খুঁত ধরিতেই ভালবাসি—কথায় বলে "নাচ্‌তে না জান্‌লে উঠানের দোষ"—কিন্তু যন্ত্রে কতটুকু করে কতটুকু কাজই বা দিতে পারে যদি না কর্ম্মঠ কুশলী দৃঢ়চেতা লোকের হাতে পড়ে? আসলে, যে যন্ত্রের চালক তাহার দোষগুণেই ভালমন্দ হয়, যন্ত্রের দোষগুণ আর কতটা? তাই শুধু আক্ষেপ হয়, এই চৌদ্দটা বৎসর কি শোচনীয় ভাবেই না নষ্ট হইয়াছে! আর শুধু নষ্ট নয়, ভবিষ্যতে যে জাতীয়তার অনুকূল একটা সুন্দর শাসনবিধি পাইব, তাহার আশাও এই চৌদ্দ বৎসরের কাণ্ডকারখানায় নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছে। গান্ধী-কংগ্রেসের অসহযোগ ও আইন-অমান্য, চিত্তরঞ্জনের obstruction নীতি ও Dyarchy ধ্বংসের প্রচেষ্টা, হিন্দুযুবকদিগের সন্ত্রাসবাদ, হিন্দুনেতাদের সাইমন কমিশন বর্জ্জন, এই সব ঘটনাপুঞ্জে মিলিয়া এমনই অবস্থা আজ করিয়াছে যে ইংরাজ আজ Communal Award সংবলিত White Paper-এর ভিত্তিতে নূতন শাসনবিধিতে জাতীয়তাবাদী হিন্দুকে একেবারে পিষিয়া ফেলিবার বন্দোবস্ত করিয়াছে। আজ এই অন্তিম সময়ে বিদ্রোহ করিয়া আর কি হইবে? কি ব্যক্তির জীবনে, কি জাতির জীবনে, সুযোগ আর অসংখ্যবার আসে না। তবে হাঁ, কাজে কিছু হউক বা না হউক, জাতীয়-আদর্শ অনুযায়ী আন্দোলন ত আমাদের করিতেই হইবে—আর তাছাড়া গান্ধীবাদের hypnotism-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের একটা মস্ত নৈতিক মূল্য আছে—সেই হিসাবে অবশ্যই আমি ইহাকে স্বাগত সংবর্দ্ধনা করি।"

কথাগুলি ভাবিবার বটে। সাধারণতঃ আমরা এত অদূরদর্শী, এত হুজুগ-প্রিয় ও সাময়িক চাঞ্চল্যপ্রিয়, এত সহজে আমরা theatrical demonstration-এ মাতিয়া যাই যে এই সবকেই জাতির মস্ত বড় উন্নতি ও spirit-এর লক্ষণ বলিয়া মনে করি; এবং সেই উত্তেজনার ঘোর যখন কাটিয়া যায় তখন আবার গভীর অবসাদের কূপে নিমজ্জিত হই। চৌদ্দ বৎসরের

অবিরত ছুট্‌ফটানি আর ধাপ্পা আর ফাঁকিবাজী আর ভণ্ডামির পর আজ সেই অবসাদ সারা ভারতময় জমাট হইয়া পড়িয়াছে। এই অবসাদ ও তূষ্ণীম্ভাবের সময়ে ধীরভাবে চারিদিকের পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া দেখিবার বোধ করি একটু সুযোগ আসিয়াছে। এই বিবেচনা করিবার পক্ষে চৌধুরী মহাশয়ের কথাগুলি আশা করি কিছু সাহায্য করিবে।

আর আমাদের এই হুজুগপ্রিয়তা ও উত্তেজনা-বিলাস শুধু যে রাজনীতিতেই আবদ্ধ তাহা নহে—রাজনীতিতে ও শাসনতন্ত্র গঠনে ত ইহার দরুণ যা অনিষ্ট হইবার হইয়াছে—পরন্তু সমাজের সর্ব্ববিভাগেই এই প্রবৃত্তিটি প্রবল। আমাদের খুব উৎকট স্বরাজপন্থীদিগের নিকটও পাশ্চাত্যদেশই আজকাল আদর্শস্থল। যখনই ইউরোপ-আমেরিকার কোন দেশে নূতন কোন একটা মতবাদ বা কর্ম্মধারা প্রচলিত হয়, তখনই দেশে সেই সব বিষয়ে পুস্তকাদি ও জনশ্রুতি আসিয়া পৌঁছিবামাত্র তদনুকরণে সব নূতন নূতন দল গজাইয়া উঠিতে থাকে। নকল-নবিশী আন্দোলনে আমরা একেবারে সিদ্ধহস্ত—"একটা নূতন কিছু করা"র মোহ আমাদের একবারে দুর্নিবার। তাই দেখিতে দেখিতে এই কয় বৎসরের মধ্যে আমাদের দেশে সোশ্যালিষ্ট পার্টি, কম্যুনিষ্ট পার্টি, ফাশিষ্ট পার্টি, ইত্যাদি কতই যে আবির্ভূত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। আর বিদেশের দেখাদেখি লালকোর্ত্তা কালকোর্ত্তা নীলকোর্ত্তার বিচিত্র-বর্ণ-সমাবেশে তরুণ ভারত একেবারে রঙ্গীণ হইয়া উঠিয়াছে। বন্ধুবর উপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় একবার বলিয়াছিলেন, "তাই তো ভাবি ব্যাপারটা হইল কি? যে ব্যক্তি সাত দিন মস্কো ঘুরিয়া আসে সে হইয়া আসে একটা প্রচণ্ড বল্‌শেভিক, রোমে যদি দুদিন থাকিয়া আসে তবে হয় আস্ত একটা ফাশিষ্ট, আর নিউ ইয়র্কে এক রাত্রি কাটাইয়া আসিলে হয় একেবারে পাক্কা ডেমোক্র্যাট। বলি, নিজেদের ঘটে কি কিছুই নাই?" আমাদের দেশের উদীয়মান প্রগতিপন্থীদের রকম সকম দেখিয়া এই কথাটাই বারংবার মনে জাগে।

আমাদের দেশের সমাজ-সংস্থান কি রকম, ইতিহাসের ধারা কোন্ মুখী, কত বিভিন্ন-ভাষাভাষী বিভিন্ন-ইতিহাস ও আদর্শ-সংবলিত জাতির সমাবেশ এই দেশে, কৃষক-ভূস্বামীর সম্পর্ক কি প্রকার, কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের আপেক্ষিক গুরুত্ব ও অবস্থান কি রকম, অন্যান্য শ্রমশিল্প-সমৃদ্ধ দেশের তুলনায় আমাদের শিল্প-প্রতিষ্ঠান কত নগণ্য—এই সমস্ত বিষয়ের বিবেচনা করিয়া, যদি ঐ সমস্ত আমদানী করা মতবাদগুলিকে সমালোচনা করিয়া, যাচাই করিয়া লইবার, আমাদের দেশকালানুযায়ী করিয়া গড়িয়া লইবার একটা চেষ্টা থাকিত তবুও বুঝা যাইত। কিন্তু সে সব গভীর চিন্তার বিন্দুমাত্র লক্ষণ নাই, বিদ্যাবুদ্ধির দৌড়ও সে পর্য্যন্ত আছে কিনা সন্দেহ। কার্য্যের মধ্যে দেখিতে পাই সেই বিদেশী বুলিগুলি ঠিক অবিকৃত ভাবে কপ্ চান—অর্থাৎ হুবহু নকল। তাই আমাদের সৌখীন বল্‌শেভিকদের মধ্যে শুধু দেখিতে পাই Comrade ভায়াদের ছড়াছড়ি; Hammer and Sickle লাঞ্ছিত লাল-ঝাণ্ডার উড়াউড়ি; "Workers of the world unite" বলিয়া চীৎকারপূর্ব্বক গলা ফাটাইবার বাড়াবাড়ি; আর পথে-ঘাটে proletariat আর petit bourgeois লইয়া নকল লড়াই, সোভিয়েটের কচ্ কচি, আর ধীরপন্থীদিগের প্রতি চরমপন্থীদের অতি করুণ অবজ্ঞার অভিনয়—মোট কথা সবশুদ্ধ জড়াইয়া অতি হাস্যাস্পদ ব্যাপার। এই প্রহসন বেশ উপভোগ্যই হইতে পারিত যদি এই সব বিদেশের আমদানী নকলনবীশী আন্দোলনের আবর্ত্তে পড়িয়া অনেক অনভিজ্ঞ আদর্শবাদী চরিত্রবান্ যুবকের জীবনের শোকাবহ পরিণতি না হইত।

তারপর শ্রমিক আন্দোলন। আমাদের দেশে এখনও যন্ত্রশিল্পের সবে সুরু। শ্রমিক-বণিকের সংঘর্ষের যে তিক্ততা ও রুদ্রতা পাশ্চাত্য দেশে দেখা গিয়াছে, তাহা স্বভাবতঃ এখনই আমাদের দেশে আসিয়া পড়িবার সময় হয় নাই—হয়ত বিবেচনার সহিত ট্রেড ইউনিয়ন কিংবা শ্রমিক আন্দোলন পরিচালিত হইলে সংঘর্ষের সে তীব্রতা হইতে এ দেশ অব্যাহতি

পাইতে পারিত। তাছাড়া, একটা বড় জিনিষ আমাদের সব সময়েই মনে রাখা দরকার। আমাদের দেশে যন্ত্রশিল্পের এই সবে শৈশব অবস্থা; একেই উন্নত বিদেশী শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সহিত প্রতিযোগিতায় আমাদের পারিয়া উঠা কঠিন; কত protection কত bounty আবশ্যক হইতেছে; এই অবস্থাতেই যদি আমাদের শ্রমিক নেতারা চাহেন যে বিলাতের বা আমেরিকার বা জার্ম্মেণীর মজুরদের সমান সমান বেতন হইবে, বাসগৃহ হইবে, খাটুনীর সময় হইবে, ইত্যাদি ইত্যাদি—তবে ত আমাদের শিল্প ব্যবসায় অচল হইয়া পড়িবে। এই রূপ নীতিকেই বলে killing the goose that lays the golden eggs -এর নীতি। অত বড় পরাক্রান্ত এবং শিল্প-ব্যবসায়ী যে জাপান, সে পর্য্যন্ত এখনও জেনিভার Labour convention স্বীকার করিয়া লয় নাই; সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টা কাজের ব্যবস্থা মানিয়া লয় নাই; কারণ জাপান জানে যে প্রতি-যোগিতায় তাহাকে জয়ী হইতে হইবে; বিলাত আমেরিকার মত গায়ে ফুঁ দিয়া বাবুগিরি মাফিক মজুরী করিলে তাহার পোষাইবে না। কিন্তু আমা-দের শ্রমিক নেতাদের কল্যাণে বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলে এবং টাটা-কোম্পানীর লোহার কারখানায় ধর্ম্মঘট ত লাগিয়াই আছে। দেশের এই দুইটি প্রধান শিল্পব্যবসায় আমাদের নেতাদিগের দাপটে টলমল করিতেছে। সব বিষয়েই একটা পরিমাণজ্ঞান থাকা দরকার। আমাদের ত তাহা নহে; একেবারে গাছে না উঠিতেই এক কাঁদি!

রাজনীতিতে অর্থনীতিতে যেরূপ সমাজনীতি শিক্ষানীতিতেও তদ্বৎ। রাজনীতিতে যেমন প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনও পাইবার পূর্ব্বেই পূর্ণ স্বরাজ ও চরকা-মার্কা জাতীয় পতাকা ও স্বাধীনতা-দিবস; অর্থনীতিতে যেমন দেশে মধ্যযুগীয় কৃষিপ্রধান সমাজ-ব্যবস্থা ও শ্রমিক-সংস্থান থাকিতেই Class War, Dictatorship of the Proletariat, Socialist Republic প্রভৃতি গরম গরম Marxist বুলি কপচান; সমাজ ও শিক্ষাবিষয়ক ব্যাপারেও তেমনই পর্দ্দা ফাঁক হইতে না হইতেই এবং পেটে ক অক্ষর পড়িতে না পড়িতেই

Companionate Marriage, Co-education, ইত্যাদির ঝঙ্কার বাজিয়া উঠিয়াছে। অনুকরণ মাত্রেই যেন বাহাদুরী, ষত্বণত্ব জ্ঞান নাই। নূতন-কিছু মাত্রই যেমন খারাপ নয়, তেমনই নূতন-কিছু হইলেই চমৎকার হয় না। স্ত্রীপুরুষের সম্পর্ক, পারিবারিক ব্যবস্থা, শিক্ষার প্রণালী, এই সমস্ত বিষয় সমস্ত সমাজশরীরের এমন সব আসল গোড়াকার ব্যাপার লইয়া নাড়া দেয় যে বিশেষ বিবেচনার সহিত এই সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে হয়। লঘুভাবে হস্তক্ষেপ করা যে যায় না তাহা নহে, বরং সেই দিকেই প্রলোভন অধিক; কিন্তু তাহার ফল অধিকাংশ স্থলেই হয় ঘোরতর উচ্ছৃঙ্খলতা ও অনাচার। আক্ষেপের বিষয় এই যে, যে পাশ্চাত্য দেশের অন্ধ অনুকরণে এই সমস্ত নব নব পরীক্ষা-প্রবর্ত্তনের চেষ্টা এক্ষণে চলিতেছে, সেই পাশ্চাত্যদেশেই এই সমস্ত বিষয়ে আজকাল চিন্তাশীল বিচক্ষণ মনীষিগণ কি রকম সাবধান বাণী উচ্চারণ করিতেছেন সে সম্বন্ধে আমাদের অত্যুৎসাহিগণ অধিকাংশই অজ্ঞ। নকল-নবিশী জীবনযাত্রার ইহাই নিদারুণ tragedy !

সমস্ত মতবাদ, সমস্ত প্রোগ্রাম, সমস্ত experiment, সমস্ত তত্ত্ব-পরীক্ষারই স্থান আছে। কিন্তু এই সকলকেই নিজের জাতির ও দেশের প্রকৃতি, অবস্থা ও প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্ত্তিত করিয়া সংশোধিত করিয়া স্বাধীনভাবে বিচার করিয়া তারপর আবশ্যকমত গ্রহণ বা বর্জ্জন করিতে হয়। ইহাই জীবন্ত জাগ্রত জাতির লক্ষণ। আর যদি তাহা না হয়, নিত্য নূতনের আস্বাদনে মত্ত হইয়া নব নব উত্তেজনায় মস্‌গুল হইয়া আজ গান্ধীবাদ, কাল বলশেভিজ্‌ম্‌, পরশু ফাশিজ্‌মের পশ্চাতে গড্ডলিকা প্রবাহের ন্যায় দেশের জনশক্তি ধাবিত হয়, তবে স্বতঃই উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার সহিত মনে প্রশ্ন জাগে, ততঃ কিম্‌?

আশ্বিন, ১৩৪১।

কঃ পন্থাঃ

কঃ পন্থাঃ

বিগত আগষ্ট মাসের দোসরা তারিখে ভারত সাম্রাজ্যশাসনের নব-বিধান ভারত-সম্রাটের অনুমোদন লাভ করিয়াছে। ইংলণ্ডের ইতিহাসে সেই প্রাচীন নর্ম্মাণ-ফ্রেঞ্চ আমলে যে মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক নৃপতিগণ পার্লামেণ্টের বিধানকে সিদ্ধ করিয়া লইতেন, সেই পুরাতন "*Le Roi le veult*" মন্ত্র দ্বারা এই নব্য-ভারতের শাসন-বিধানও পূত হইয়াছে। আজ হইতে অষ্টাদশ বর্ষ পূর্ব্বে আর এক আগষ্ট মাসে বিশ্বব্যাপী মহাসমরের সন্ধিক্ষণে ভারত-রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণের যে ঘোষণা প্রচারিত হইয়াছিল—যাহার প্রথম অধ্যায় সেই বিশ্ব-সমরের অবসানের অব্যবহিত পরে মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কারে প্রকটিত হইয়াছিল—সুদীর্ঘ ষোড়শ বর্ষ পরে তাহার দ্বিতীয় অধ্যায়ের আজ সূচনা হইল।

এই দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূচনা বড় সহজে সম্পন্ন হয় নাই। সপ্ত-বর্ষব্যাপী জল্পনা-কল্পনা আলাপ-আলোচনা হুঙ্কার-ঝঙ্কারের পরে আজিকার এই

সূচনা। প্রথমে সাইমন কমিশন, তারপর তাহার পুনরাগমন, তারপর বড়লাট আরুইনের Dominion Status-সম্পর্কীয় আশ্বাস-বাণী, তারপর গোল-টেবিল বৈঠক—এক নম্বর, দুই নম্বর, তিন নম্বর—তারপর White Paper, তারপর Joint Parliamentary Committee, তারপর Draft Bill, তারপর পার্লামেণ্টের উভয় সভায় অজস্র কচ্‌কচি, তারপর বিল পাস, তারপর সম্রাটের সম্মতি—and then the Bill has become an Act ! এই বিল্‌ অথবা য়্যাক্টের ভাল মন্দ যাহাই হউক, এই সুদীর্ঘ সপ্ত-বর্ষ-ব্যাপী অক্লান্ত উৎসাহ John Bull-এর doggedness-এর প্রকৃষ্ট পরিচয় বটে।

আর এই বিধানটিকে ঠিকঠাক মত গন্তব্যস্থানে পেঁছাইতে পথে বাধা-বিঘ্নই কি কম গিয়াছে? একদিকে ভারতবর্ষে কংগ্রেসী চমূর হ্রেষা-রব, অপরদিকে ইংলণ্ডে চার্চ্চিল-বাহিনীর বৃংহিত-নিনাদ—অনেক সময়েই মনে হইয়াছে স্যার স্যামুয়েল হোর সাহেবের caravan বুঝি মরু-পথেই মারা পড়ে। কিন্তু অকুতোভয়ে অসীম ধৈর্য্যের সহিত caravan-টির পরিচালক উভয়বিধ আরাবকেই কুক্কুরারাবের ন্যায় উপেক্ষা করিয়া উহাকে ঠিক গন্তব্যস্থানে আনিয়া পৌছাইয়া দিয়াছেন ; এবং দিয়াই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া আবার দম লইয়া—to fresh fields and pastures new—নূতন যশোমাল্য অর্জ্জন করিতে গিয়াছেন ; এবং জেনিভার রাষ্ট্রসঙ্ঘের রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া বিজয়ী বীরের ন্যায় সগর্ব্বে ঘোষণা করিয়াছেন :

"We steadily promote the growth of self-government in our own territories. For example, only a few weeks ago, I was responsible for helping to pass through the Imperial Parliament a great and complicated measure to extend self-government to India."

সত্যই হোর সাহেব গর্ব্ব করিবার অধিকারী বটেন।

এ ত গেল বিলাতের কথা। আমাদের এ দেশেও এই সাত বৎসর কিছু বড় স্বস্তিতে কাটে নাই। এ কয় বৎসরের ইতিহাস যেন এক সপ্ত-বর্ষব্যাপী গর্ভ-যন্ত্রণার ইতিহাস। আর গর্ভিণীর নিত্য নূতন নূতন দোহদ-শংসার ন্যায় ভারতীয় নেতৃগণেরও নিত্য নূতন নূতন উদ্ভট কার্য্যকলাপে এই বিচিত্র অধ্যায় পরিপূর্ণ। ভারত-জননীরই দুর্ভাগ্য!

সাইমন কমিশন আসিল নূতন সংস্কার সম্পর্কে আলোচনা করিতে, আমাদের অতি বুদ্ধিমান্ নেতৃগণ করিলেন তাহা বয়কট—মন্ত্র উচ্চারিত হইল, Go back Simon; তাহার রিপোর্ট বাহির হইল—ফতোয়া হইল, রিপোর্টকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেও—to the waste-paper basket; আরুইন সাহেব বিলাতে গিয়া অনেক সলা-পরামর্শ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া Dominion Status-এর ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন—আমাদের কংগ্রেসী কর্ত্তারা পঞ্চনদে ইরাবতী তীরে ঘোষণা করিলেন "পূর্ণ স্বরাজ"; গান্ধী মহাত্মা অনেক গবেষণা করিয়া inner voice-এর সহিত বহুবার যোগস্থ হইয়া পূর্ণ স্বরাজের অব্যর্থ পন্থা আবিষ্কার করিলেন—লবণ জ্বাল দেওয়া; গোল-টেবিল বৈঠকে আহ্বান আসিল, কংগ্রেসী পাণ্ডারা ঠিক করিলেন যে বিলাতের গোল-টেবিল অপেক্ষা এ দেশের জেলখানাই বেশী স্বাস্থ্যকর, তাই দলে দলে জেলে গিয়া শয়তানী গবর্ণমেণ্টের খরচান্ত করাইলেন; বেশী দিন জেলে থাকা ততটা স্বাস্থ্যকর বোধ না হওয়াতে শেষটা গান্ধী মহাত্মা ভারতমাতার একমাত্র প্রতিভূ হিসাবে বিলাতে হাওয়া বদ্‌লাইতে গেলেন; কিন্তু সে হাওয়াও তেমন স্বাস্থ্যকর মালুম হইল না, তাই ফিরিয়া দেশে আসিয়া পুনরায় বোম্বাই অঞ্চলের প্রসিদ্ধ স্বাস্থ্য-নিবাস ইয়ারোদা জেলে প্রবেশ করিলেন; সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেকে তাঁহার অনুসরণ করিলেন। কিন্তু স্যার স্যামুয়েল হোর ও বড়লাট উইলিংডন প্রবর্ত্তিত অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর আব-হাওয়ায় এমন যে সব তেজীয়ান্ কংগ্রেসী তুরঙ্গম, অচিরেই তাহারা একেবারে আধমরা হইয়া গেল এবং পূর্ব্বের সেই হ্রেষারব আর শ্রুতিগোচর হইল না।

বর্ত্তমানেও সেই অবস্থাই চলিতেছে। বহুবিধ গলাবাজী ফট্‌কাবাজী চরকাবাজীর পর স্বয়ং মহাত্মা গান্ধীর ধারণা হইয়াছে—ও সব কিছু নয়, আসলে there is nothing like leather—সুতরাং নানাস্থানে হরিজন tannery প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। এবার সম্ভবতঃ গান্ধীমার্কা স্বরাজ আর না আসিয়া যায় না। আর যে সব কংগ্রেসী নেতা গুরুভক্তি সত্ত্বেও চর্ম্ম-মাহাত্ম্যে ততটা আস্থাবান্ নহেন, তাঁহারা ফিরিয়া কাঁচিয়া গণ্ডূষ করিতেছেন—অর্থাৎ যে সব council, assembly প্রভৃতি তাঁহারা সদর্পে বর্জ্জন করিয়া আসিয়াছিলেন এবং যাহাতে প্রবেশ করা দেশদ্রোহিতার চরম লক্ষণ বলিয়া চতুর্দ্দশ বৎসর পূর্ব্বে চীৎকার করিয়াছিলেন, সেই সব অস্থান-কুস্থানেই আবার ঢুকিয়া পড়িয়াছেন; এবং এখন চেষ্টায় আছেন কি করিয়া মন্ত্রিত্ব-পদ প্রভৃতিও হজম করা যায়, অথচ বহুল-প্রচারিত অসহযোগিত্বও খাঁটিভাবে বজায় রাখা যায়। দারুণ patriot কংগ্রেসীদের "সত্যমূর্ত্তি" এই ভাবেই বর্ত্তমানে প্রকটিত হইতেছে। সুতরাং বৃথা বলি নাই যে হোর সাহেব গর্ব্ব করিবার অধিকারী বটেন।

যাহা হউক, ভারত-শাসনের নব-বিধানের সূচনার ইতিবৃত্ত এদেশে ও বিদেশে যে আকার ধারণ করিয়াছিল তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ দেওয়া গেল। এখন তাহা ত অতীত ইতিহাস। ঝগড়া-ঝাঁটি, মান-অভিমান, আবদার-হুম্‌কী ইত্যাদি কত লীলাই ত আমরা দেখিয়াছি—কালসাগরে বুদ্বুদের ন্যায় সে সকল এখন বিলীন হইয়া গিয়াছে—সেই সকল ঘাত-প্রতিঘাতের net result যাহা, তাহা আজিকার এই বিধানটিতেই প্রকট।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য ও বিচার্য্য এই যে এই বিধানটির স্বরূপ কি, এবং ইহা দ্বারা আমরা আত্মনিয়ন্ত্রণের দিকে কতটা অগ্রসর হইয়াছি, এবং ইহার সাহায্যে আমাদের মাতৃভূমির সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল কতটা সংসাধিত হইতে পারে। তাছাড়া, ইহার মধ্যে যে সমস্ত অপূর্ণতা বা অভাব বা বিকৃতি রহিয়াছে তাহার জন্য প্রকৃত প্রস্তাবে দায়ী কে, এবং দায়ী যেই হউক সেই সমস্ত অভাব ও বিকৃতির কি প্রকারে প্রতিবিধান করা যাইতে

পারে তাহাও ধীরভাবে বিচার্য্য। বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থা-সমাবেশে কি পন্থা অবলম্বন করিলে দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইবে, এইরূপ আলোচনাতেই তাহার দিঙ্‌নির্ণয় হইতে পারে।

বকরূপী ধর্ম্ম মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে চারিটি প্রশ্ন করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান ভারতে আমাদের দেশকর্ম্মীদের নিকটও সেই চারিটি প্রশ্নই উপস্থিত হইয়াছে:

কা চ বার্ত্তা কিমাশ্চর্য্যম্
কঃ পন্থাঃ কশ্চ মোদতে ?

দুইটি প্রশ্নের সমাধান হইয়া গিয়াছে, আর দুইটি প্রশ্ন এখনও সমাধান-সাপেক্ষ। প্রথম প্রশ্ন, কা চ বার্ত্তা ? আমাদের রাজনৈতিক বার্ত্তা ত এই নবীন শাসন-পদ্ধতিতেই প্রকাশ। দ্বিতীয় প্রশ্ন, কিমাশ্চর্য্যম্ ? তাহার উত্তর এই যে, আমাদের দেশীয় রাষ্ট্রনেতৃগণের যে রকম সূক্ষ্মবুদ্ধি ও কাণ্ডজ্ঞান তাহাতে আদৌ যে কোন শাসন-সংস্কার আসিয়াছে ইহাই পরম আশ্চর্য্য। এখন তৃতীয় প্রশ্ন, কঃ পন্থাঃ ? ইহার সদুত্তরের উপরই নির্ভর করিবে চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর, কশ্চ মোদতে ? কে হৃষ্ট হইবে ? যদি পন্থার প্রকৃত নির্দ্দেশ আমরা ভাগ্যবলে আবিষ্কার করিতে পারি তাহা হইলে ভবিষ্যতে প্রত্যেক দেশ-হিতৈষীই হৃষ্ট হইবে ; আর যদি ভারতের দুর্ভাগ্যক্রমে বিগত চতুর্দ্দশ বৎসরের ন্যায় অপথে-বিপথে-কুপথে অবিশ্রান্ত পরিভ্রমণই আমাদের ললাট-লিপি হয়—অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ—তাহা হইলে কে হৃষ্ট হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়।

বর্ত্তমানে যে নব-শাসন-পদ্ধতি বিধিবদ্ধ হইল তাহার স্বরূপ কি ? তর্কের সময়ে, আন্দোলনের সময়ে, controversy-র সময়ে অনেক অতিশয়োক্তি হইয়া থাকে, সে সময়কার সকল কথাকেই অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলিয়া ধরিলে একেবারেই অবিচার করা হয়। কোন একটা বড় ব্যাপার—বিশেষতঃ রাজনীতিতে—যখন অনুষ্ঠান করিবার আয়োজন হয় তখন নানা বাদবিতণ্ডা উঠে। কেহ বলে যে এরূপ ব্যাপার আর ভূভারতে দেখা যায় নাই ; আবার

প্রতিপক্ষ বলিয়া উঠে যে ব্যাপারটা আগাগোড়া ভুয়া, একেবারে একটা colossal hoax—প্রকাণ্ড ধাপ্পাবাজী। সে সময় হইল দর কষাকষির সময়। কেহ কোন বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করিতে চাহেনা; মনে করে যে সেরূপ করিলে আর বেশী কিছুই পাওয়া যাইবে না; অতএব সব বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করা অথবা প্রকাশের ভাণ করা ফ্যাশান হইয়া দাঁড়ায়। যথা, এমন যে Communal Award যাহাতে মুসলমান-সমাজ স্বপ্নেরও আগোচর প্রভাব প্রতিপত্তি লাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছে, তাহাতেও অনেক মুসলমান লোক-দেখানর খাতিরে অসন্তুষ্টির ভাণ করিতেছে। এ কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, টানাটানি বা controversy-র অবস্থায় এই নূতন শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে যত সমস্ত বিশেষণ বা অভিধা দেশীয় তরফ হইতে প্রযুক্ত হইয়াছে সে সমস্তই কিছু প্রকৃত নহে। সে সমস্ত বিশেষণের উদ্দেশ্য ছিল বর্ত্তমান আকারের প্রস্তাবে আমাদের বিশেষ অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া ইহাকে আমাদিগের আরও বেশী অনুকূল ও মনঃপূত করিয়া তোলা। এখন সে stage অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে, টানাটানির অবস্থা আর নাই, এখন পরিপূর্ণ final আকারে—যাহাকে আজকালকার ভাষায় complete picture বলে—সেই আকারে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে; এখন আর controversial stage-এর অতিশয়োক্তি করিয়া লাভ নাই। বস্তুতঃ ব্যাপারটা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহা ধীরভাবে অনুত্তেজিতভাবে বিচারের সময় এখন আসিয়াছে।

নিরপেক্ষভাবে বলিতে গেলে প্রথমেই স্বীকার করিতে হয় যে প্রথম এবং দ্বিতীয় গোল-টেবিল-বৈঠকে নবীন শাসন-সংস্কারকে যে ভাবে গঠনের প্রস্তাব হইয়াছিল এবং ভারতীয় প্রতিনিধিগণ যাহাতে সোৎসাহে সায় দিয়াছিলেন, বর্ত্তমান বিধিবদ্ধ সংস্কার-প্রস্তাবটিও সেই আদত গঠনভঙ্গিমা বা essential structure-টিকে মূলতঃ বজায় রাখিয়াছে। এই গঠনভঙ্গিমাটি ত্রিধা বিভক্ত—Provincial Autonomy, Central Responsibility এবং All-India

Federation। এই ত্রিধারার মধ্যে প্রথমটি সাইমন কমিশনই অনুমোদন করিয়াছিল, তৃতীয়টিও আভাসে-ইঙ্গিতে করিয়াছিল; তবে দ্বিতীয়টিতে রাজী হয় নাই। সে যাহা হউক, নবশাসন-সংস্কারের এই যে তিনটি দিক্, ইহার প্রত্যেক দিক্ই বর্ত্তমানে যে শাসন-পদ্ধতিতে আমরা চলিতেছি, তাহার তুলনায় বহু সুদূরপ্রসারী—যাহাকে ইংরাজীতে বলে great advance—তর্কের মত্ততায় ইহা অস্বীকার করিলে সত্যের অপলাপ হইবে। এই তিনটি বিষয়েরই কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক।

Provincial Autonomy কথাটি দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন অর্থে ভারতীয় রাজনীতিতে ব্যবহৃত হয়—ইহাতে একটু বুঝিতে গোলমাল হয়, দুইটি স্বতন্ত্র কথা ব্যবহৃত হইলেই ভাল হইত। সে যাহা হউক, অর্থ দুইটি এই। প্রথম অর্থ, Autonomy of the Provinces in relation to the Centre অর্থাৎ কেন্দ্রীয় বা ভারত গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের নিরপেক্ষতা বা স্বাতন্ত্র্য; সোজা কথায়, প্রদেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারত গভর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না—অবশ্য বিভিন্ন-প্রদেশ-সংক্রান্ত বা নিখিল-ভারতীয় যে সব ব্যাপার তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন, কিংবা আরও অন্য কয়েকটি সুনির্দ্দিষ্ট ব্যাপারে মাত্র হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন—অন্য কোন বিষয়েই পারিবেন না; ইহাই হইল Provincial Autonomy। কিন্তু ইহাতে বুঝায় না প্রদেশে প্রজাতন্ত্র শাসন হইবে কিংবা স্বেচ্ছাতন্ত্র শাসন হইবে; কারণ ইহার যে কোন প্রকার শাসনতন্ত্র হইলেও কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট হইতে প্রদেশের স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকিতে পারে। আলিবর্দ্দি খাঁ যখন বাঙ্গালার নবাব ছিলেন, তখন তিনি দিল্লীর বাদশাহের বড় একটা তোয়াক্কা রাখিতেন না—সুতরাং সে সময়েও এই অর্থে Provincial Autonomy ছিল বলিলে অন্যায় হয় না।

কিন্তু এ প্রকার Autonomy-র জন্য ত আমাদের উৎসাহ নহে। আমরা চাই Provincial Autonomy দ্বিতীয় অর্থে। সে অর্থটি

এই—the Provincial Executive must be wholly responsible to the Provincial Elected Legislature—অর্থাৎ প্রদেশে পূরামাত্রায় পূর্ণ প্রতিনিধিমূলক শাসন বা Representative Government হইবে। আমাদের আকাঙ্ক্ষা এইরূপ বলিয়া সচরাচর এই অর্থেই আমরা কথাটাকে ব্যবহার করি। কিন্তু বিলাতী রাজনৈতিক পরিভাষায় কথাটি সচরাচর প্রথম অর্থেই ব্যবহৃত হয়।

সে যাহাই হউক, নূতন শাসনপদ্ধতিতে এই উভয় অর্থেই প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। অর্থাৎ কেবল যে কেন্দ্র হইতে প্রদেশ স্বতন্ত্র হইবে তাহা নহে, প্রদেশের সমস্ত শাসন-বিভাগ—রাজস্ব, শিক্ষা, পুলিশ, জেল, বিচার, পূর্ত্ত, স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন, আবগারী, ব্যবসায়-বাণিজ্য ইত্যাদি যাবতীয় কার্য্য—পরিচালনা করিবেন নির্ব্বাচিত ব্যবস্থা-পরিষদের মন্ত্রিগণ ; এবং ব্যবস্থা-পরিষদ্ বা council প্রভৃতিতে সব সভ্যই হইবে নির্ব্বাচিত বা elected, কোন nominated বা official সভ্য থাকিবে না। সুতরাং প্রদেশে পূরামাত্রাতেই পার্লামেণ্টারী শাসন প্রবর্ত্তিত হইবে। অবশ্য আসল গঠন-প্রকারটি এই—ইহার মধ্যে গভর্ণরের বিশেষ ক্ষমতা, safe-guards প্রভৃতি আরও অনেক খুঁটিনাটি আছে, যাহাতে স্বায়ত্ত শাসনের পূর্ণতা কতকটা খর্ব্ব হইয়াছে। সে সব আলোচনা পরে করা যাইবে ; এখন প্রধানতঃ আসল রূপটি স্পষ্ট করিয়া দেখা দরকার। ইংরাজীতে একটা কথা আছে, One must not miss the wood for the trees ; সেটা সর্ব্বদাই স্মরণ রাখা আবশ্যক। ইহা বলাই নিষ্প্রয়োজন যে বর্ত্তমান শাসন পদ্ধতির nominated এবং official সভ্য-সংবলিত ব্যবস্থা-পরিষদ্ ও Transferred-Reserved ভাবে দ্বিধা-বিভক্ত শাসনযন্ত্রের তুলনায় নূতন শাসন-পদ্ধতিতে কার্য্যের পরিসর এবং সুযোগ বহু-বিস্তৃত। বস্তুতঃ structure হিসাবে ইহাকে প্রাদেশিক পূর্ণ-স্বরাজ বলা যাইতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, কলিকাতা কর্পোরেশনে এখন

যে পরিমাণ স্বরাজ আছে, তদপেক্ষা অনেক পূর্ণতর স্বরাজ প্রাদেশিক শাসনতন্ত্রে থাকিবে।

দ্বিতীয় কথা, Central Responsibility—অর্থাৎ কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টেও প্রতিনিধিমূলক শাসন-পদ্ধতির অবতারণা। এই অবতারণা অবশ্য সম্পূর্ণ নহে, আংশিক ; এখানে এক প্রকার Dyarchy বা দ্বৈতশাসন প্রস্তাবিত হইয়াছে। ভারত-সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শাসন-কার্য্য দায়িত্ব-সম্পন্ন ব্যবস্থা-পরিষদের মন্ত্রিমণ্ডলের হস্তে ন্যস্ত থাকিবে—অর্থাৎ রাজস্ব, রেলওয়ে, ডাক-বিভাগ, ব্যবসায়-বাণিজ্য, শুল্ক-বিভাগ ইত্যাদি সকলই মন্ত্রিগণ নিয়ন্ত্রণ করিবেন ; কিন্তু সেনা-বিভাগ ও বৈদেশিক বিভাগ—army and foreign relations —বড়লাটের নিজহস্তে reserved থাকিবে ; এবং রাজস্ব বিষয়েও, যাহাতে ভারতবর্ষের credit-এর তারতম্য হইতে পারে এমন কোন প্রকাণ্ড loan তুলিতে হইলে বড়লাটের অনুমতি লইতে হইবে। এখনকার শাসন-পদ্ধতিতে ইহার কিছুই নাই, অর্থাৎ কোন বিভাগই দায়িত্বসম্পন্ন মন্ত্রীর হস্তে নাই ; সমস্ত বিভাগই বড়লাটের হস্তে, তিনি তাঁহার Executive Council বা শাসন-পরিষদের সহায়তায় সমস্ত শাসন-তন্ত্র নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকেন। এই Central Responsibility কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টে আমূল পরিবর্ত্তন আনিয়ন করিবে, এবং ইহারই বিরুদ্ধে বিলাতে চার্চ্চিলের দল আপ্রাণ লড়াই করিয়াছিল। তাহাদের বক্তব্য ছিল এই যে, প্রদেশে যেমন তেমন হউক experiment চলিতে পারে কিন্তু কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট বড়লাটের হস্তচ্যুত হইলে প্রলয়কাণ্ড হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। সে যাহাই হউক, নূতন সংস্কারে যাঁহারা কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টে মন্ত্রী হইবেন, তাঁহাদের কার্য্য-পরিধি সুবিস্তীর্ণ।

তারপর তৃতীয় কথা, All-India Federation—সমগ্র ভারত, ব্রিটিশ প্রদেশ ও দেশীয় করদ-রাজ্য, একই শাসন-যন্ত্রে নিয়মিত হইবে। সত্য কথা বলিতে গেলে এই সম্মিলিত ভারত-রাষ্ট্রের কল্পনা একটা খুব বড় কল্পনা, একটা inspiring conception ; বহু দেশভক্ত মনীষী তাঁহাদের

দেশচর্য্যার অন্তরালে ভারতের এই মহনীয় কল্পনাই পোষণ করিতেন—The United States of India গঠন করাই তাঁহাদের স্বপ্ন ছিল। সাইমন কমিশনও এই কল্পনার পোষকতা করিয়াছিলেন, কিন্তু বাস্তবিক আজই ইহার প্রতিষ্ঠা হইতে পারে, এতটা মনে করিতে পারেন নাই। কিন্তু নূতন শাসন-পদ্ধতির কাঠামর মধ্যে এই Federation একটা প্রধান অঙ্গ। Federation হইতে হয়ত দুইচারি বৎসর বিলম্ব হইতে পারে; কিন্তু ইহা একপ্রকার স্থির নিশ্চিত যে সব দেশীয় রাজ্যই এই Federation-এর মধ্যে আসিয়া পড়িবে, এবং তখন একই মন্ত্রিমণ্ডল, একই শাসনতন্ত্র সমস্ত ভারতবর্ষকে শাসন করিবে। ভবিষ্যৎ সম্মিলিত-ভারত রাষ্ট্রের যিনি প্রধান মন্ত্রী হইবেন, তিনি যে আসমুদ্র-হিমাচলে তাঁহার শাসনদণ্ড পরিচালনা করিবেন সে বিষয়ে সংশয়মাত্র নাই। নূতন শাসন-বিধির বর্ত্তমান অপূর্ণতা ও রক্ষাকবচের বাহুল্যে এই মূল মোটা কথাটা বিস্মৃত হইলে চলিবে না।

সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে নূতন শাসন-পদ্ধতির অনেক খুঁটিনাটি সম্বন্ধে আমাদের খুঁতখুঁতি আপত্তি অভিযোগ থাকিলেও মূলতঃ যে গঠন-ভঙ্গিমায় ভারত-শাসনের নব-বিধান গঠিত হইয়াছে তাহার বিরুদ্ধে কিছুই বলিবার নাই। যে সকল বিষয়ে ইহার খর্ব্বতা বা বিকৃতি রহিয়াছে সেইগুলি কালক্রমে দূর করিতে পারিলেই পরিপূর্ণ আত্ম-কর্ত্তৃত্ব ভারতে প্রবর্ত্তিত হইবে। একথা যে অত্যুক্তি নহে সে বিষয়ে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে কংগ্রেসপন্থীদিগের বহু নিন্দাবাদ সত্ত্বেও এই ভবিষ্য গভর্ণমেণ্ট সম্বন্ধেই কংগ্রেসী নেতা সত্যমূর্ত্তি বহুবার বলিয়াছেন, এইবার কংগ্রেসী গভর্ণমেণ্ট শীঘ্রই স্থাপিত হইবে, অতএব কংগ্রেসকে ভোট দেও, কংগ্রেস-বিরোধিগণ হুঁসিয়ার। কংগ্রেস-বিরোধিগণ হুঁসিয়ার হইবেন কিনা কিংবা কংগ্রেসকে সবাই ভোট দিবে কিনা সে কথা বলিতে পারি না, কিন্তু আসল কথাটা খাঁটি সত্য—অর্থাৎ দেশের মধ্যে যে দল সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল, অর্থাৎ popular party, তাহারাই শাসনতন্ত্র অধিকার করিবে। সত্যমূর্ত্তির এই আস্ফালন

অপেক্ষা আর বড় সার্টিফিকেট এই নবীন শাসন-পদ্ধতির হইতে পারে না।

নূতন শাসন-পদ্ধতির মূল আকৃতিটি সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করা গেল; এখন ইহার অন্যদিক্ অর্থাৎ বিকৃতি ও অপূর্ণতার দিক্ দেখা যাউক। এই দিক্ আলোচনা করিতে গেলে অতি সহজেই ধরা পড়িবে এই বিকৃতি ও অপূর্ণতার জন্য দেশীয় নেতৃবর্গের অবিমৃষ্যকারিতা কতখানি দায়ী। প্রধানতঃ দুইটি বিষয়ে নব শাসন-পদ্ধতি defective এবং re-actionary—প্রথম হইল safeguards, দ্বিতীয় Communal Award।

প্রথমতঃ safeguards বা রক্ষাকবচের বিষয়ই ধরা যাউক। এই রক্ষা-কবচের ভিতরের কথাটা কি? ইংরাজের ভারতাগমনের গোড়ার কথা ইহার ভিতরে নিহিত রহিয়াছে। তাহারা আসিয়াছিল এদেশে বাণিজ্য করিতে। এখনও ইংরাজ প্রধানতঃ বণিক্ জাতি, এবং এখনও ইংরাজ বণিক্ যে পরিমাণ ধন এদেশে উপার্জ্জন করে এবং দেশে লইয়া যায় তাহার তুলনায় ভারতে ইংরাজ রাজকর্ম্মচারীদিগের ও ইংরাজ সৈনিকদিগের বেতন ও গভর্ণমেণ্টের Home Charges অকিঞ্চিৎকর। সুতরাং তাহাদের বাণিজ্য-ব্যবসায় সমূলে যাহাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত না হয় সে ব্যবস্থা তাহারা কবিবেই। তবে ইংরাজ বুদ্ধিমান্ জাতি এবং উহাদের মোটামুটি একটা ন্যায়পরতাও আছে—তাই ইহারা মিট্‌মাট করিতে এবং সন্ধি করিতে জানে। তাহা জানে বলিয়াই আজ ব্রিটিশ শাসনেও বিলাতী কাপড়ের উপর গুরুতর শুল্ক বসিয়াছে, ম্যাঞ্চেষ্টারের তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও। নচেৎ যদি হিট্‌লারী প্রণালী অবলম্বন করিয়া আজ ইংরাজ বোম্বাই-বাঙ্গালার সমস্ত কাপড়ের কল বন্ধ করিয়া দিয়া ল্যাঙ্কাশায়ারের মাল চালাইত, তবে কে কি করিতে পারিত? কিন্তু মিট্‌মাট করিতে রাজী বলিয়া surrender করিতে ইংলণ্ড মোটেই রাজী নহে। ইংলণ্ডবাসীর কোটি কোটি টাকা ভারতে invested রহিয়াছে—সেই সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি

ব্যবসায়-বাণিজ্য একেবারে বেহাত হইয়া যাইবে ইহা তাহারা কিছুতেই বরদাস্ত করিতে পারে না। বাস্তব জগতে কোথাও এরূপ হয় না। অথচ কংগ্রেসী হিন্দু নেতারা কায়েন মনসা বাচা অতি পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়া দিতে কিছুমাত্র কসুর করেন নাই যে একবার ক্ষমতা হাতে পাইলে হয়, তারপর কি যে করিবেন তাহার ঠিকই নাই—বিলাতী কাপড় একদম বন্ধ করিয়া দিবেন, বিলাতী জাহাজ ভারতোপকূলে চলিতে দিবেন না, Gillanders Arbuthnot, Mackinnon Mackenzie, Andrew Yule প্রভৃতিকে রাতারাতি স্বরাজী কারখানায় পরিণত করিয়া ফেলিবেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। ক্ষমতা হাতে পাইলে এই সব করা ভাল কি মন্দ সে বিষয়ে তর্ক উঠিতে পারে, কিন্তু ক্ষমতা হাতে না পাইয়া এবং পাইবার বহু পূর্ব্ব হইতেই এপ্রকার বাহ্বাস্ফোট আর কিছু না হউক অন্ততঃ যে bad tactics তাহাতে সন্দেহমাত্রং নাস্তি। এবংবিধ লম্ফঝম্পের ফল যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে। Safeguards-এর প্রবর্ত্তন দ্বারা এই সব সম্ভাবনার ফাঁক একেবারে বন্ধ করা হইয়াছে। এখন তাঁহাদের কৃত কার্য্যের অপ্রত্যাশিত সফলতায় উৎফুল্ল হইয়া কংগ্রেসী পাণ্ডাগণ নিজের নিজের অঙ্গুলি লেহন করিতে থাকুন!

এই হইল এক প্রকার safeguards—commercial safeguards—বাণিজ্য-ব্যবসায় ঘটিত রক্ষাকবচ। আর এক প্রকার safeguards হইল বিপ্লব-বিদ্রোহ সম্বন্ধীয়—ordinance করিবার ক্ষমতা, constitution suspend করিবার ক্ষমতা, terrorism সম্বন্ধে পুলিশের বিশেষ ক্ষমতা ইত্যাদি। ইহার কারণ খুঁজিতেও আর বেশী দূর যাইতে হইবে না। গত চৌদ্দ বৎসরের অবিশ্রাম কংগ্রেসী ধূমধাম—non-co-operation, picketing, boycott, civil disobedience—তদুপরি terrorist সম্প্রদায়ের vendetta—ইহাই এই জাতীয় রক্ষাকবচের যথেষ্ট কারণ। তারপর আর এক উৎপাত জুটিয়াছে কয়েক বৎসর ধরিয়া—communal riots বা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা—আজ কাণপুর, কাল করাচী, পরশু সহিদগঞ্জে

"রক্তবরণ হইল ধরণীতল"—ইহার পর safeguards-এর বিরুদ্ধে কথা বলাই দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে। এই যে অবিরাম অবিশ্রান্ত anti-British obsession—ইহার ফলে এই সব রক্ষাকবচ প্রতিপক্ষ রচনা করিবে না?

অথচ সত্য কথা বলিতে গেলে, ব্যারিষ্টার-প্রবর শ্রদ্ধেয় বিজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই সেদিন সাহস করিয়া যাহা বলিয়া ফেলিয়াছেন, "Since the declaration of August, 1917, defining full responsible Government in India as the goal of British policy, no reason exists why India should fight England" —একথার কোন উত্তর নাই। শাসন-সংস্কারের pace বা গতিবেগ লইয়া মতভেদ হইতে পারে, মনান্তরও হয়ত কতকটা হইতে পারে; কিন্তু সংঘর্ষের একেবারেই কারণাভাব। তারপর, সেই ঘোষণা প্রচার করিয়াই ইংলণ্ড ক্ষান্ত হয় নাই; দুই বৎসরের মধ্যেই মণ্টেগু-সংস্কার বিধিবদ্ধ হইয়া গেল; তাহা বয়কট করিবার কোন কারণ ছিল না, এবং বয়কট করা রাজনৈতিক চাল হিসাবেও যে colossal blunder হইয়া গিয়াছে তাহা আজ ভারতের হিন্দুর অবস্থা দেখিলেই অনুমিত হয়—এমন কি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন পর্য্যন্ত শেষজীবনে মুক্তকণ্ঠে ইহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তারপরে মণ্টেগু-আইনানুসারে দশ বৎসর পরে Statutory Commission বসিবার কথা—লর্ড বার্কেনহেড তাড়াতাড়ি করিয়া বৎসর দুই আগেই উহা বসাইলেন যাহাতে দশ বৎসরের মধ্যেই নূতন আইন বিধিবদ্ধ হইতে পারে—সে কমিশন অকারণে বয়কট হইল; Dominion status-এর ঘোষণার উত্তরে Civil Disobedience আরম্ভ হইল; এরকম খামখা নিষ্কারণ নিষ্কাম বিরোধিতা আর কখনও হইয়াছে বলিয়া স্মরণ হয় না। তারপর আসিল গুঁতা, গুঁতার চোটে অবিলম্বে সব ঠাণ্ডা—একেবারে জোড়হস্তে মহাত্মা গান্ধীর respectful co-operation এবং অতঃপর একেবারে বানপ্রস্থ। ব্যস্! safeguards হইবে না ত কি হইবে?

অথচ একথা ভুলিয়া গেলে চলিবে না যে মণ্টেগু-সংস্কারের অব্যবহিত পরে লর্ড রেডিংএর আমলে Repressive Laws কমিটি বসাইয়া Press Act প্রভৃতি অনেকগুলি দমনমূলক আইন তুলিয়া দেওয়া হইল, লর্ড আরুইনের আমলে ধীরে ধীরে interned যুবকদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল, ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের গোড়ায় আর একটিও internee রহিল না। তারই অব্যবহিত পরে একদিকে চট্টগ্রামে terrorist raid এবং অপরদিকে কংগ্রেসী আইন-অমান্য আন্দোলন—আমিষ ও নিরামিষ এই উভয়বিধ আন্দোলনে মিলিয়া এমন একটি কাণ্ড করিয়া তুলিল যে সব repressive laws আবার নূতন করিয়া চাপিয়া বসিল। এখন আবার সেইগুলি তুলিয়া দিবার প্রচণ্ড চেষ্টা হইতেছে। পণ্ডশ্রম আর কাহাকে বলে?

তারপর দ্বিতীয় ব্যাপার হইল Communal Award। ইহারও মূল কারণ হিন্দু নেতৃগণের attitude। যে রকম ব্রিটিশ-বিদ্বেষী মনোবৃত্তির পরিচয় কংগ্রেস-নেতৃত্বাধীনে হিন্দুগণ দিয়াছে, তাহাতে নূতন শাসন-পদ্ধতির বিস্তৃত ক্ষমতা যে হিন্দুর হাত হইতে যথাসম্ভব কাড়িয়া লইতে ইংরাজ চেষ্টা করিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্যের কি আছে? বাস্তবিকই ইহা punitive award। ঢিলটি মারিলে পাটকেলটি খাইতেই হয়—ইহাই বাস্তব জগতের নিয়ম। তবুও ত ইংরাজ ভদ্রলোক, দুই একদিনের উৎপাতে এই ব্যবস্থা সে করে নাই। মণ্টেগু-শাসনসংস্কারে যে সাম্প্রদায়িক বণ্টন হইয়াছিল তাহাতে হিন্দুগণ বঞ্চিত হয় নাই। যদি হিন্দুগণ গান্ধীর পশ্চাতে পশ্চাতে আলেয়ার পানে ছুটাছুটি করিয়া শক্তিসামর্থ্যের সমূহ অপচয় না করিয়া দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ-প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া শাসনযন্ত্র পরিচালনা করিতেন, তবে হিন্দুগণের আজ মাথায় হাত দিয়া বসিতে হইত না। দেশের অবস্থা শাসন-সংস্কার অন্য আকার ধারণ করিত। যাক্ সে কথা। অসহযোগ আন্দোলন ও হিন্দু-কর্ত্তৃক সাইমন কমিশন বয়কট সত্ত্বেও সাইমন রিপোর্টে সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত সমর্থিত হইয়াছিল, তাহাতেও হিন্দুগণের প্রতি অবিচার

করা হয় নাই। সে রিপোর্ট কি হিন্দুগণ সমর্থন করিয়াছিলেন? শুধু ইংরাজকে গালাগালি দিলে কি হইবে? সাইমন রিপোর্টও ইংরাজেরই রিপোর্ট। তারপর আসিল Civil Disobedience-এর বাহ্বাস্ফোট এবং terrorism-এর বিষস্ফোট। কত আর সয়? ফল হইল Communal Award। কাজেই safeguards এবং Communal Award-এর অবতারণা ethical না হইতে পারে কিন্তু ইহার psychology অতি সুস্পষ্ট। ইহাদের অবসান যদি সুদূর ভবিষ্যতেও করিবার ইচ্ছা থাকে তবে এই নিষ্কারণ ব্রিটিশ-বিদ্বেষ-দুষ্ট মনোবৃত্তি ত্যাগ করিতে হইবে।

ইহাত গেল একদিকের কথা। কিন্তু এই ব্যাপারের আরও একটা দিক্ আছে। আজ যাহারা Communal Award-এর বিরুদ্ধে খুব জোর গলাবাজী করিতেছেন, এবং "Fight the Communal Award" বাণীকে এক প্রকার মন্ত্রের মত দাঁড় করাইবার প্রয়াস পাইতেছেন, তাঁহাদের অনেককেই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের অতিমাত্রায় ভক্ত দেখিতে পাই। এই প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করি, তাঁহারা চিত্তরঞ্জনের হিন্দু-মুসলমান প্যাক্টের কথা কোন দিন শুনিয়াছেন কি? সেই বিখ্যাত চুক্তির দুই একটি ধারা এস্থলে উল্লেখ করা সমীচীন বোধ হয়। প্রথম ধারাটিই এই:

Representation in the Bengal Legislative Council is to be on the population basis with separate electorates.

একেবারে জনসংখ্যার অনুপাতে স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচন—ইহার মধ্যে কোন অস্পষ্টতা কোন বটে-কিন্তু নাই। ম্যাকডোনাল্ড সাহেবের রোয়দাদে মুসলমান-দিগকে ইহার অপেক্ষা কিছু বেশী দেওয়া হয় নাই। মৌলবী আবদুল করিম সাহেব—যিনি এই চুক্তির অন্যতম জনক—তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন:

If seats were allocated according to the terms of the Hindu-Muslim Pact, the Muslims would have got a larger number.

আর একটি ধারা এই :

Of the Government posts, 55% should go to the Mahomedans, to be worked out in the following manner: In fixing of seats for different classes of appointments, the Mahomedans satisfying the least test should be preferred till the above percentage is attained, and after that according to the proportion of 55 : 45, the former to the Mahomedans and the latter to the Non-Mahomedans, subject to this that for the intervening years a small percentage of posts, say 20%, should go to the Hindus.

অতি পরিষ্কার ব্যবস্থা! সয়তানী গভর্ণমেণ্টও বোধ করি এখন পর্য্যন্ত এতটা মেরুদণ্ডহীন ও পক্ষপাত-দুষ্ট হইতে পারে নাই।

তারপর ধর্ম্মসম্বন্ধীয় উদারতা বিষয়ক একটি ধারা :

Religious toleration is to be observed by not allowing music in procession before any mosque.

Toleration বা উদারতার অভিনব ব্যাখ্যা বটে! সয়তানী গভর্ণমেণ্ট তবু এই বাদ্যোদ্যম ব্যাপারে নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি সময় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছে। এই সব বিচিত্র দেশভক্তি এবং ধর্ম্মোদারতা-মূলক ধারা-সংবলিত চুক্তিনামাটির নীচে স্বাক্ষর করিয়াছেন কে? শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু, সেক্রেটারী বি-পি-সি-সি, ১৮।১২।২৩। অথচ শুনিতে পাই, আজকাল শ্রীমান্ সুভাষচন্দ্র separate electorate এবং Award-এর ঘোরতর বিরোধী। আমি জিজ্ঞাসা করি, যাঁহারা চিত্তরঞ্জনের প্যাক্ট অম্লানবদনে হজম করিয়াছেন, তাঁহারা Communal Award-এর নিন্দা করেন কোন্ মুখে? শুধু দলাদলির খাতিরে অথবা চাল হিসাবে Award-কে গালাগালি দিলে ত আন্তরিকতা ও অকপটতা প্রকাশ পায় না।

এখনও অনেক লোকের মুখে শুনিতে পাই—তাঁহারা আবার পণ্ডিত মালবীয়-প্রবর্ত্তিত নূতন "জাতীয়" দলের ধুরন্ধর—যে বাঙ্গালাদেশে Award অনুসারে যে বণ্টন হইয়াছে—অর্থাৎ কার্য্যতঃ যাহার ফলে ব্যবস্থা-পরিষদে মুসলমান সভ্য-সংখ্যা সম্পূর্ণ সভ্য-সংখ্যার প্রায় অর্দ্ধাংশ—তাহাতেও নাকি তথায় মুসলমানদিগের কোন প্রাধান্য থাকিবে না, বরং ইহাতে নাকি তাহাদের প্রতি অবিচারই করা হইয়াছে। তবে কাহাদের প্রাধান্য থাকিবে? না, ২৫০জন সভ্যের মধ্যে ২৫জন যে ইউরোপীয় সভ্য থাকিবে তাহারাই রাজত্ব করিবে। হিন্দু-মুসলমান যদি বাঙ্গালায় এতই একাত্মা একপ্রাণ, তবে ২৫ জন সাহেব কি করিয়া ২২৫ জনের উপর ছড়ি ঘুরাইবে? হেঁয়ালী বটে! এই সমস্ত বালোচিত হাস্যাস্পদ কথা বলিয়া মুসলমানদিগের মনোরঞ্জন করিবার ও তাহাদিগকে দলে টানিবার প্রয়াস "জাতীয়" দলের নেতৃস্থানীয় লোকেরাও করিয়া থাকেন। ইহার পর আর ইহা কি আশ্চর্য্যের বিষয় যে করাচীতে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায় ইংরাজ-সৈন্যের গুলি-বর্ষণের নিন্দাসূচক প্রস্তাব জাতীয়দলের নেতারাও কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে সমর্থন করিয়াছেন? এই সকল ব্যাপারের পরে আর কে Communal Award-এর বিরুদ্ধে উচ্চ চীৎকারের আন্তরিকতায় বিশ্বাস করিবে? আর যাহাই হউক, ইংরাজ ত নির্ব্বোধ নহে। তাই Joint Parliamentary Committee-র রিপোর্টে স্পষ্টই লিখিত হইয়াছে:

There is among all the communities in India (not excepting the Hindus) a very considerable degree of acquiescence in the Award.

যে মুহূর্ত্তে গান্ধী Communal Award-এর শুধু নিম্নশ্রেণী-বিষয়ক ধারা কয়েকটি লইয়া উপবাস ঘোষণা করিলেন, সেই মুহূর্ত্তেই তিনি উহার অপর সব অংশ মানিয়া লইলেন। তারপরে গান্ধী-কংগ্রেসের "Neither accept nor reject the Award" নীতি ত এতদিনে বিশ্ববিখ্যাত formula হইয়াই দাঁড়াইয়াছে।

এই সমস্ত মিথ্যাচার, কপটতা ও ভণ্ডামি এবং তাহার বিষময় ফল দেখিয়া আমার শুধু একটা কথাই মনে পড়ে—কথাটি স্বামী বিবেকানন্দের—"চালাকী দ্বারা কোন মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হয় না।" আমাদের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থা ভাল হইতে পারে, খারাপ হইতে পারে; যাহাই হউক না কেন, ইহাকে যদি উন্নততর, পূর্ণতর, সবলতর করিতে হয়, তবে চাই স্পষ্টবাদিতা, চাই বাস্তবের প্রতি নিষ্ঠা, চাই সত্যের প্রতি আগ্রহ—ইহাই প্রকৃত সত্যাগ্রহ। গড্ডলিকা-প্রবাহের ন্যায় পালে পালে জেল ভর্ত্তি করাই সত্যাগ্রহ নহে।

বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের গলদ কোথায়, আমাদের নিজেদের বিকৃত ও নির্ব্বোধ কার্য্য-পদ্ধতি আমাদের দুর্দ্দশার জন্য কতটা দায়ী, ভারতের রাষ্ট্রক্ষেত্রে কোন্ কোন্ শক্তি কার্য্য করিতেছে, শাসন-যন্ত্রে বিস্তৃত ক্ষমতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন জাতি, হিন্দু মুসলমান শিখ প্রভৃতির মধ্যে একটা রেষারেষি, একটা শক্তি-পরীক্ষা কতটা অনিবার্য্য—এই সমস্ত বিষয় তলাইয়া এবং নিজেকে ফাঁকি না দিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে। নচেৎ শুধু pose, শুধু ন্যাকামি, শুধু চালবাজী—হিন্দু মুসলমান সব ভাই ভাই—হিন্দু মন্ত্রী বা মুসলমান মন্ত্রী হওয়া সমানই কথা—বাঙ্গালার ভাষা বাঙ্গালাই থাকুক কিংবা উর্দ্দুতে পরিণত হউক তাহাতে বাঙ্গালার কিংবা বাঙ্গালী হিন্দুর শিক্ষার কিংবা সংস্কৃতির কিছু আসে যায় না—এই সমস্ত অলীক অপ্রকৃত ভাঁওতা দিয়া শুধু নিজেকেই প্রবঞ্চিত করা যায়। আসল সমস্যার তাহাতে কোন সমাধান হয় না।

চাই বাস্তবতা—আবশ্যক realism। রাজনীতিক্ষেত্র বড় কঠিন ঠাঁই। শুধু রাজনীতিক্ষেত্র কেন, সংসারই বড় কঠিন ঠাঁই। এখানে দুর্ব্বলের স্থান নাই, অত্যুদার বিশ্ব-প্রেমিকের স্থান নাই, ostrich policy এখানে আত্মহত্যার নামান্তর মাত্র। কাজেই আজ যদি ভারতবর্ষে—বিশেষতঃ বাঙ্গালাদেশে—হিন্দুগণ নিজের কর্ম্মদোষে বিপাকে পড়িয়া থাকে, তবে সে কর্ম্মফল তাহাকে ভোগ করিতে হইবে, গত্যন্তর নাই। নূতন শাসন-পদ্ধতির

চক্রনেমির তলদেশে যদি হিন্দু আজ পতিত হইয়া থাকে, তবে সেই চক্রকে অবলম্বন করিয়াই আবার উর্দ্ধে উঠিবার প্রযত্ন করিতে হইবে ; চক্র হস্তচ্যুত করিলে চলিবে না ; হস্তচ্যুত করিলে যে স্বদুস্তর পঙ্কে নিমগ্ন হইতে হয় সে বিষয়ে ত গত চতুর্দ্দশ বৎসরে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে। চেষ্টা করিতে হইবে, পরিশ্রম করিতে হইবে—চক্ষুকর্ণ বুজিয়া নয়, সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাম সতেজ সজাগ সক্রিয় রাখিয়া, বিপুল বিক্রমে সাধনা করিতে হইবে—চক্রকে আবর্ত্তিত করিবার নিমিত্ত। ভরসা আছে, হয়ত সাধনা সিদ্ধ হইবে, কারণ "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ স্নখানি চ"। নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতেঽয়নায়।

আশ্বিন, ১৩৪২।

সতের বৎসর পরে

সতের বৎসর পরে

চৌদ্দই জুলাই জগতের ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন। প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্স দেশের রাজধানী পারী-নগরীতে ১৪ই জুলাই তারিখে যে এক বিস্ময়কর ঘটনার অভিনয় হইয়াছিল তাহা পৃথিবীর রাষ্ট্র-বিপ্লবের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিয়াছিল। সেই ঘটনাকে বলে Storming of the Bastille—অর্থাৎ পারী নগরীর বিরাট্ প্রাচীন পাষাণ কারাগৃহ, যে কারাগৃহ ফ্রান্সের স্বেচ্ছাচারী বুর্ব্বোঁ রাজতন্ত্রের সুদৃঢ় সুরক্ষিত দুর্গস্থানীয় ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, সেই কারাগৃহের বা সেই দুর্গের অধিকার। মুক্তিকামী পারীর জনসংঘ সেইদিন এই কারাগৃহ দখল করিয়া এবং বন্দীদিগকে মুক্তি দিয়া বিশ্ববিশ্রুত ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের সূচনা করিয়া-ছিল। আজও তাই ফ্রান্সে ও ফরাসী-অধিকৃত জনপদে এই দিনটি স্বাধীনতা-দিবস বলিয়া অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

আর এবার এই ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে আমাদের এই ভারতবর্ষে এই চৌদ্দই জুলাই তারিখেই এক অভিনব বিপ্লবের সূচনা হইয়াছে। ইহাও বিপ্লবই বটে —যতই অহিংস নিরুপদ্রব ও বিধিসঙ্গত ভাবে হউক না কেন। এবারকার এই তারিখে ভারতের নানা প্রদেশে ভারতের জাতীয় মহাসমিতি বা কংগ্রেসের তরফ হইতে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করা হইয়াছে; অর্থাৎ আজকালকার প্রচলিত ভাষায় "citadel of the British Bureaucracy" কে "capture" করা হইয়াছে—বাঙ্গালায় বলিতে গেলে ব্রিটিশ "বুড়োখাসি"র বা আমলাতন্ত্রের আদত ঘাঁটিটি দখল করা হইয়াছে। আশা করা যায় যে ফ্রান্সদেশে বাষ্টিল-দুর্গ দখলের ন্যায় ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের এই দুর্গ-দখল ব্যাপারও সুদূরপ্রসারী ফল প্রসব করিবে।

এই মন্ত্রিত্ব-গ্রহণ অথবা শাসনতন্ত্র নিজেদের আয়ত্তের মধ্যে আনয়ন করা —ইহার পশ্চাতে আমাদের দেশে এক সুদীর্ঘ এবং বিচিত্র ইতিহাস রহিয়াছে। সতের বৎসর পূর্ব্বে—অর্থাৎ মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড সংস্কার প্রবর্ত্তিত দ্বৈতশাসন প্রাণালী বা dyarchy প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই—এই মন্ত্রিত্ব-গ্রহণ লইয়া, শাসন-যন্ত্রকে ব্যবহার করা লইয়া, ঘোরতর বিতণ্ডার সূত্রপাত হয়। সুরেন্দ্রনাথ-প্রমুখ বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞদিগের অভিমত ছিল যে, নূতন শাসন-সংস্কারে যতটুকু ক্ষমতা আসিয়াছে জনসাধারণের প্রতিনিধি-গণের হস্তে, তাহার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিয়া দেশের স্বাস্থ্য-শিক্ষা-কৃষি-বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করা, জনগণের আত্মসম্মান জ্ঞান উদ্বুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে নিজেদের শক্তি সামর্থ্যে বিশ্বাসবান্ করিয়া তোলা, এবং ক্রমশঃই অধিকতর পরিমাণে শাসন-তন্ত্রকে নিজেদের মুঠার মধ্যে আনিয়া ফেলা একান্ত বিধেয়। তাই তাঁহারা বলিলেন, নব-প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাপক সভায় দেশের গণ্যমান্য লোক প্রবেশ করুন, এবং তেজস্বী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়া দেশের উন্নতি-কল্পে আপনাদের সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করুন। কিন্তু এই কর্ম্মপন্থার বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন গান্ধী-প্রমুখ ভাবুকতাপন্থী নেতৃগণ।

তাঁহারা বলিলেন, না, যখন ঐ শাসন-সংস্কার আমাদের সম্পূর্ণ মনোমত হয় নাই, আমরা আত্মকর্ত্তৃত্বের যে ষোল-আনা অধিকার দাবী করি, তাহা যখন ইংরাজরা আমাদিগকে দেয় নাই, তখন আর ওদিক্ দিয়া আমরা যাইব না, শাদা মুখ হেরিব না, ব্যবস্থাপক সভায় যাইব না, মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করা ত দূরের কথা; অতএব কর বয়কট, কর অসহযোগ, এবং হাতে যখন হাতিয়ার নাই তখন লাগাও অহিংস আন্দোলন, চালাও আইন-অমান্য, ইংরাজ যদি শাসন করিতে আসে তবে চল জেলে।

এই ঘোরতর বিতণ্ডায় দেশের রাজনৈতিক আকাশ মুখরিত হইতে লাগিল। দ্বন্দ্ব-কোলাহলে গগন-পবন মথিত হইয়া বিষম হলাহল উঠিতে লাগিল; গান্ধীপন্থিগণ পূর্ব্বতন নেতাদিগকে দেশদ্রোহী কৃতঘ্ন কাপুরুষ ধামাধরা ইত্যাদি নানাবিধ সুরুচি-সম্মত অহিংস অভিধায় ভূষিত করিতে লাগিলেন। দেশে তখন পঞ্চনদের ভয়াবহ ঘটনা-পরম্পরায় ভীষণ ক্ষোভ ও গ্লানির সঞ্চার হইয়াছিল, কবিবর রবীন্দ্রনাথ মনের আবেগে তাঁহার "নাইট" উপাধি প্রত্যাখ্যান করিলেন। এই ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ অবস্থাতে মহাত্মা গান্ধী-প্রচারিত ভাবুকতার বাণী জনগণকে অতিমাত্রায় স্পন্দিত করিয়া তুলিল; কলিকাতার ওয়েলিংটন স্কোয়ার কংগ্রেসে ১৯২০ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে গান্ধীর জয় হইল—ভাবুকতার নিকটে বিচক্ষণ রাষ্ট্রনীতি পরাজিত হইল।

আর আজ সতের বৎসর পরে—১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে—সেই অসহযোগ, সেই উন্মত্ত ভাববাতিকতাগ্রস্ত পর্ব্বের সমাধা হইল। এই দীর্ঘ সপ্তদশ বর্ষ ধরিয়া যে প্রশ্ন লইয়া কত বিরোধ কত কলহ কত গৃহবিচ্ছেদ কত অনাবশ্যক যন্ত্রণা অত্যাচার সংঘটিত হইয়াছে সে প্রশ্নের আজ সমাধান হইল, সে বিরোধের সে অত্যাচারের আজ অবসান হইল। তাই যেদিন প্রথম জুলাই মাসে সংবাদ প্রকাশিত হইল যে কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব-গ্রহণের সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে, সেই দিন আমার বিশেষ শ্রদ্ধেয় এক বন্ধু—যিনি বাঙ্গালা-দেশে কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠানের অন্যতম নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি—তাঁহার করমর্দ্দন

করিয়া আমি বলিলাম, "We meet after seventeen years" ; কথাটির ইঙ্গিত বুঝিয়া বন্ধুবর একটু হাস্য করিলেন।

আজিকার এই আনন্দের দিনে কিন্তু ভাবিবার অনেক বিষয় আছে, এই হর্ষ-কোলাহলের মধ্যেও বিষাদ-ভারাক্রান্ত হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। প্রথমেই এই প্রশ্ন মনে জাগে, এই সুবুদ্ধি সতের বৎসর আগে হইল না কেন? যে মহাত্মা গান্ধী এবারকার মন্ত্রিত্ব-গ্রহণ ব্যাপারে প্রধান উদ্যোগী, যাঁহার অসাধারণ ব্যক্তিত্বের ফলেই এবারও যাঁহারা মন্ত্রিত্ব-বিরোধী ছিলেন, জোয়াহির লাল নেহরু প্রভৃতি, তাঁহারা দমিত হইয়া গিয়াছেন, সেই মহাত্মা গান্ধীই ত সেবার শাসনতন্ত্র বর্জ্জনের প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। কেন এমন হইল? গান্ধী হয়ত নিজে দেশের রাজনৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতার ফলে এখন sadder but a wiser man হইয়াছেন ; কিন্তু দেশের পক্ষে ত সতেরটি বৎসর একেবারে নষ্ট হইল। কোন জাতির পক্ষেই সপ্তদশ বৎসর একেবারে নগণ্য নহে, অন্ততঃ যে দেশে "*Swaraj* by the 31st December," "Education may wait, but *Swaraj* cannot," ইত্যাদি দৈববাণী ও আর্ষবাণী মুহুর্মুহুঃ প্রচারিত হইয়াছিল, সেদেশে ত নহেই। যে অবস্থার আজ উদ্ভব হইয়াছে, সেই অবস্থা সম্পূর্ণ পরিমাণে না হউক, যথেষ্ট পরিমাণে সতের বৎসর পূর্ব্বেই উদ্ভূত হইতে পারিত। দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের হস্তে শাসনযন্ত্র থাকিলে ইতিমধ্যে দেশের চেহারা ফিরিয়া যাইত ; আর এই যে সুদীর্ঘ নিরর্থক ছটফটানির ইতিহাস, কত অর্থনাশ মনস্তাপ প্রাণবিসর্জ্জনের ইতিহাস, ইতিহাসের এই মর্ম্মন্তুদ অধ্যায়টি রচনার কোন কারণ ঘটিত না।

এই কথা শুনিয়া হঠাৎ কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন, বলেন কি? এই যে বিপুল বিপ্লব-প্রচেষ্টা, এই যে বিরাট্ ভারতব্যাপী আন্দোলন, ইহা কি একেবারেই নিষ্ফল বলিতে চাহেন? একেবারে ব্যর্থ মনে করেন? এই আন্দোলন যদি না হইত, তবে কি আজিকার এই পূর্ণতর স্বরাজ আসিয়া পড়িত?

যাঁহারা গত বিশ বৎসর ধরিয়া—অর্থাৎ বিগত মহাযুদ্ধের পর হইতে —ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস এবং আন্তর্জ্জাতিক ইতিহাস বিশেষ পর্য্যালোচনা করেন নাই, তাঁহাদের মুখে এই রকম প্রশ্ন মোটেই অস্বাভাবিক নহে। কারণ, তাঁহাদের মনে সেই ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বেকার ধরণ-ধারণই প্রকট হইয়া রহিয়াছে; তাঁহাদের মানসিক চিন্তাধারা কার্জ্জন-যুগ হইতে বিশেষ অগ্রসর হয় নাই—সেই যুগ, যখন ব্রিটিশ-সিংহ সত্য সত্যই কেশরি-বিক্রমে সসাগরা ধরাকে প্রকম্পিত করিত, যে যুগে সম্রাট্ সপ্তম এডোয়ার্ড বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহকে বড়লাটের সভাতে আইন-সচিব করাতে, বলিয়াছিলেন যে একটা নেটিভকে ভারত-শাসনের অন্দর-মহলে ঢুকান কি ঠিক হইতেছে, "নেটিভে সন্ধান পাবে আমাদের জেনানা" অনেকটা এই ভাব—রাষ্ট্রনৈতিক সম্ভাব্যতা বিষয়ে তাঁহাদের চিত্ত সেই যুগেই বিচরণ করিতেছে।

কিন্তু বস্তুতঃ আজ সে যুগ নাই। মহাযুদ্ধের সময় হইতেই ব্রিটিশ-সিংহের কি এক প্রকার ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে; আজকালকার কাণ্ডকারখানা দেখিয়া ব্রিটিশ জাতি যে একটা দুর্দ্ধর্ষ সাম্রাজ্যমদগর্ব্বী বলদৃপ্ত জাতি তাহাই মনে হয় না; মনে হয় যেন একেবারে গলিত-নখ-দন্ত হইয়া ভদ্রলোক বনিয়া গিয়াছে, "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুণা" মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন হইয়া গিয়াছে, অথবা "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ" নীতি সম্বল করিয়া একেবারে মহাত্মা গান্ধীর চেলাদের খাতায় নাম লিখাইয়াছে। নহিলে কি আজ ভূমধ্য-সাগরে মুসোলিনির ধমকে ইংরাজ চুপ করিয়া থাকে, অথবা প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানের হুম্‌কীতে পলায়ন করে? অথচ আজও নৌ-বলে জাপান ইংরাজের সমকক্ষ নহে, মুসোলিনির নৌ-বহর ইংরাজের তুলনায় ত নগণ্য বলিলেই হয়। মানবচরিত্রাভিজ্ঞ অদ্বিতীয় সেনা-নায়ক নেপোলিয়নের কথাই কেবল মনে পড়ে, "Even in war the moral is to the physical as ten is to one"—সমর-ক্ষেত্রেও

বাহুবল অপেক্ষা চিত্তবলের প্রভাব দশগুণ বেশী। কাজেও দেখিতেছি তাহাই। ইংলণ্ডের morale বা চিত্তবলই যেন নষ্ট হইয়া গিয়াছে। যে ক্ষাত্রশক্তি, যে চিত্তবল, যে জিগীষা সাম্রাজ্য-গঠনে এবং সাম্রাজ্য-রক্ষণে অপরিহার্য্য, বর্ত্তমান যুগে ব্রিটিশ জাতি যেন তাহাই হারাইয়া ফেলিয়াছে। সার্টিফিকেট দেখাইয়া, কৈফিয়ৎ দিয়া, ভালমানুষ সাজিয়া, নিরীহভাবে বাম্‌নাই করিয়া, আর যাহাই সম্ভব হউক না কেন, রাজ্যশাসন সম্ভব নহে। কিন্তু ক্রমশঃই দেখা যাইতেছে যে ইংরাজকে এই বাম্‌নাইতে পাইয়া বসিয়াছে। দুই একজন চার্চ্চিল ব্রেণ্ট্‌ফোর্ডের আস্ফালন ইহার গতিরোধ করিতে পারিতেছে না।

কেন এমন হইতেছে তাহার কারণ হঠাৎ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এক একটা জাতির উত্থান-পতনের ইতিহাস বড়ই রহস্যময়। যখন উত্থান হয়, তাহা কি ইংরাজ জাতির, কি ফরাসী জাতির, কি শিখ জাতির, কি মারাঠা জাতির, তখন কি উন্মত্ত উচ্ছ্বসিত বেগেই সে জাতি উন্নতির তরঙ্গে উঠিতে থাকে—কারণ সহসা ঠাহর করিয়া উঠা যায় না। আবার যখন অবনতি সুরু হইতে থাকে, তাহা কি রোমক সাম্রাজ্যের, কি মোগল সাম্রাজ্যের, কি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের, তখন এমন অপ্রতিহত গতিতে তাহা ঘটিতে থাকে যে তাহা থামানও যায় না, অথচ তাহার কারণ নির্দ্ধারণও কষ্টসাধ্য।

মহাযুদ্ধের সময় হইতে ইংরাজের ভাবান্তরেও সেই কথাই প্রযোজ্য। হইতে পারে যে বিশাল বিশ্বব্যাপী রাজত্বের ভারে ইংরাজের একটা স্থবিরতা আসিয়া পড়িয়াছে, ইংলণ্ড-জননী এক্ষণে বৃদ্ধা গৃহিণীর অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছেন; তাহার সন্তান-স্থানীয় উপনিবেশগণ ও অধীনস্থ দেশগুলি এখন লায়েক হইয়া উঠিয়াছে; তাহাদিগকে স্বাধীনভাবে ঘরকন্না করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া বৃদ্ধা জননী এখন হরিনামের মালাই শেষ সম্বল করিয়াছেন। কাজেই ইংরাজ এখন আর ঝঞ্ঝাটের মধ্যে থাকিতে চাহে না, কোন ঝক্কী পোহাইতে রাজী নহে।

তাই ইংরাজ যুবকগণ এখন হইয়া দাঁড়াইয়াছে too proud to fight —they will not fight for their king and country ; ইংলণ্ডে সৈনিক-শ্রেণীতে লোক ভর্ত্তি হইতেছে না, রণমন্ত্রী হোর-বেলিশা সাহেবের বিস্তর খোসামুদী সত্ত্বেও ; ইংলণ্ড আজ সাম্রাজ্যের অংশের পর অংশ স্বেচ্ছায় ছাড়িয়া দিতেছে ; মিশর ছাড়িয়াছে, ইরাক ছাড়িয়াছে, আয়র্লণ্ড ছাড়িয়াছে, এখন প্যালেষ্টাইন ছাড়িতেছে, কানাডা অষ্ট্রেলিয়া দক্ষিণ-আফ্রিকা প্রভৃতি উপনিবেশ ত Statute of Westminster দ্বারা এক রকম ছাড়িয়াই বসিয়া আছে, বাকী ছিল ভারতবর্ষ তাহাও ত ছাড়িবার উপক্রম। ইংরাজের বোধ করি এখন মনোভাব এই যে পার্থিব রাজ্যভোগ যথেষ্ট করা গিয়াছে, এখন "Kingdom of Heaven"-এর জন্য চেষ্টা আবশ্যক। সত্য কথা বলিতে, মহাযুদ্ধের পর হইতে যে ভাবে ইংলণ্ড স্বর্গরাজ্য অধিকারের জন্য কোমর বাঁধিয়া লাগিয়াছে তাহাতে ভরসা করা যায় যে তাহাদের স্বর্গ-প্রাপ্তির আর বিশেষ বিলম্ব নাই।

বিগত বিশ বৎসরের আন্তর্জ্জাতিক ইতিহাসে ইংলণ্ড যে কর্ম্মপন্থা অনুসরণ করিয়াছে, ভারতবর্ষেও মোটামুটি সেই পন্থাই অনুসৃত হইয়াছে। বস্তুতঃ বলিতে গেলে মণ্টেগু সাহেবের সেই বিখ্যাত ঘোষণা-বাণী—the goal of British Government in India is the progressive realisation of responsible Government—সেই ঘোষণা-বাণীর সময় হইতেই ইংলণ্ডের কার্জ্জনীয় যুগ বা সাম্রাজ্যবাদের যুগের অবসান। সুতরাং মণ্টেগু-শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তিত হইবার পর হইতে ইহা কিছুতেই বলা চলে না যে আমরা রুদ্ধদ্বার কক্ষে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছি, মাথা খুঁড়িয়াই হউক অথবা যে প্রকারেই হউক সেই রুদ্ধদ্বার ভাঙ্গিতেই হইবে ; কারণ রুদ্ধদ্বার ত আর নাই, দ্বার ত খোলা হইয়া গিয়াছে—খোলা দ্বারের গায়ে মিছামিছি মাথা খুঁড়িয়া মরাকে নিরর্থক নির্ব্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। সেই শাসন-সংস্কারের পর হইতে মতভেদ যেটুকু, সেটুকু গতিবেগ বা

pace of progress লইয়া—progress-এর সম্ভাব্যতা কিংবা আদর্শ লইয়া নহে। এই মোটা কথাটা মনে রাখিতে হইবে। অতএব, বিগত সতের বৎসরের ইতিহাসে কংগ্রেসের কর্ম্মধারা কতটা পরিমাণে দেশকে নিরর্থক নিপীড়নে ও নির্য্যাতনে অভিভূত করিয়াছে, এমন কি ইহার আন্দোলনই বর্ত্তমান নব-শাসনতন্ত্রের বিকৃতিগুলির জন্য কতটা পরিমাণে দায়ী, তাহা সংক্ষেপে কিন্তু ধীরভাবে বিচার করা বোধ করি অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

মণ্টেগু-শাসনতন্ত্রের আইনের খসড়াতেই ছিল যে অনধিক দশ বৎসর পরে পুনরায় শাসন-সংস্কার হইবে। সুতরাং গোড়াতেই দ্বৈতশাসনের অসম্পূর্ণতার অজুহাতে প্রকাণ্ড অসহযোগ আন্দোলনের কোন আবশ্যকতা ছিল না। অবশ্য একটা কথা মনে রাখিতে হইবে যে দ্বৈতশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-কল্পে গান্ধী অসহযোগ প্রবর্ত্তন করেনও নাই; প্রত্যুত ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের অমৃতসর কংগ্রেসে তিনি শাসনতন্ত্রে যোগদানেরই সমর্থন করিয়াছিলেন; এবং সেই কংগ্রেস পঞ্চনদের গুরুতর ঘটনাবলীর পরেই বসিয়াছিল, এবং সেই রক্তরঞ্জিত জালিয়ানওয়ালাবাগের পুণ্যভূমিতেই তাহার অধিবেশন হইয়াছিল; তথাপি তিনি বয়কটের বিরোধী ছিলেন। হঠাৎ ১৯২০ খৃষ্টাব্দের নিদাঘ-সময়ে অভাবনীয় কারণে অসহযোগের মহিমা তাঁহার মস্তিষ্কে স্ফুরিত হয়, এবং খিলাফতের বাত্যা সেই অসহযোগের বহ্নিকে প্রধূমিত করিয়া তুলে। এ সব এখন প্রাচীন ইতিহাসে—ইহার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

এই সম্পূর্ণ অনাহূত অনাবশ্যক আন্দোলন যদি না হইত, গান্ধী-প্রমুখ নেতৃগণ যদি সুরেন্দ্রনাথ-প্রমুখ নেতৃগণের সহিত মিলিত হইয়া দেশের শাসন ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিতেন, তবে দেশের অবস্থা আজ অন্য আকার ধারণ করিত। খিলাফতের বিষাক্ত বাতাস ভারতবক্ষে যে সাম্প্রদায়িক-বিদ্বেষ বিষের বীজাণু ছড়াইয়া দিয়াছে, তাহা অঙ্কুরিত পল্লবিত হইয়া উঠিবার অবকাশ হইত না; যে দমনমূলক বিধিগুলি—repressive laws—লইয়া আজ এত কলরব, মনে রাখা উচিত যে সেইগুলির অধিকাংশই লর্ড রেডিংএর

আমলে বাতিল হইয়া গিয়াছিল, ব্যাপকভাবে বিপ্লবান্দোলন প্রবর্ত্তিত হওয়াতেই পুনরায় সেই সব আসিয়া চাপিয়া বসিয়াছে, সেই সব দমন-বিধির চিহ্নমাত্র থাকিত না। কংগ্রেস-আন্দোলন প্রধানতঃ হিন্দুচালিত আন্দোলন হওয়াতে এবং ইহা নিরন্তর ব্রিটিশ-বিদ্বেষ উদ্গিরণ করাতে, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের হিন্দু-মুসলমান চুক্তির অনুসরণ করিয়া, হিন্দুগণকে কোণঠাসা দুর্ব্বল পঙ্গু করিবার নিমিত্ত যে Communal Award নিক্ষেপ করিলেন, সেই award-এর কোন কথাই উঠিত না। তাই বলিতেছিলাম যে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে অসহযোগের প্রবাহে গা ঢালিয়া না দিলে আজ ভারতবর্ষের সমস্যা অনেক সহজতর হইত, অবস্থা অনেক উন্নততর হইত।

যাহা হউক, প্রথম গান্ধী-আবেগের বন্যার কথা যদি ছাড়িয়াও দিই, ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে লর্ড রেডিং যখন Round Table Conference আহ্বান করিবার প্রস্তাব করিলেন—যে প্রস্তাব গান্ধী ছাড়া প্রায় সমস্ত জাতীয় নেতাদিগের মনঃপূত ছিল—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনত একরকম উদ্‌গ্রীবই হইয়াছিলেন—তখনও গান্ধী তাঁহার খিলাফতী বন্ধুবর্গের খাতিরে সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন। আর এক সুযোগ নষ্ট হইল। কাহারও এবিষয়ে সন্দেহ নাই যে দ্বৈতশাসনের কাঠামর মধ্যে যতটা সম্ভব, অর্থাৎ দুই একটি সামান্য বিষয় ছাড়া, প্রায় প্রাদেশিক সমস্ত বিষয়ই মন্ত্রীদিগের হস্তান্তরিত হইবার সম্ভাবনা ছিল—ঐ কন্‌ফারেন্সের ফলে। মহাত্মা এই কন্‌ফারেন্স পণ্ড করিয়াছিলেন বলিয়াই চিত্তরঞ্জন মনের আক্ষেপে বলিয়াছিলেন, "The Mahatma bungled and mismanaged"!

কন্‌ফারেন্স ত পণ্ড করিলেন, তারপর চৌরীচৌরার ব্যাপারের পর অসহযোগও ছাড়িয়া দিলেন, এবং পরে মহাত্মাজী কারাগৃহে প্রবেশ করিলেন; আন্দোলন নিভিয়া গেল। চিত্তরঞ্জন, মতিলাল নেহরু প্রভৃতি গান্ধীবাদের ভুল বুঝিতে পারিলেন, কাউন্সিল বয়কট করা যে অত্যন্ত অবিবেচনার কাজ

হইয়াছিল তাহা হৃদয়ঙ্গম করিলেন, তাই নূতন করিয়া স্বরাজ্য-পার্টি গঠন করিলেন; কিন্তু প্রাক্তন কর্ম্মফলে ঐখানেই আট্‌কাইয়া পড়িলেন, অর্থাৎ কাউন্সিলে গেলেন বটে কিন্তু মন্ত্রিত্ব লইতে পারিলেন না, কারণ মন্ত্রিত্ববাদিগণকে দেশদ্রোহী আখ্যা দিয়া তখন তখনই আর কোন্ মুখে মন্ত্রিত্ব লয়েন? কাজেই মন্ত্রিত্ব-ধ্বংস নীতি অবলম্বিত হইল; তজ্জন্য "No method is too mean" মন্ত্র প্রচারিত হইল, বিষম অনিষ্টের আকর Bengal Hindu-Moslem Pact স্বাক্ষরিত হইল—যাহাতে বর্ত্তমান award অপেক্ষাও অধিক-সংখ্যক সভ্য separate electorate-এর মূলে মুসলমানদিগকে দেওয়া এবং চাকুরীও ৫৫% দেওয়ার প্রস্তাব হইল; চিত্তরঞ্জন-প্রকল্পিত এই প্যাক্টে তদানীন্তন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক হিসাবে সুভাষচন্দ্র স্বাক্ষর করিলেন—আরও কত কি কাণ্ড হইল। ফলে কিছুদিনের জন্য বাঙ্গালাদেশে সমুদায় শাসনযন্ত্র re-transferred হইল, অর্থাৎ মন্ত্রিমণ্ডল অচল হইল, সুতরাং আমলাতন্ত্র নিষ্কণ্টক হইল; অর্থাৎ একেবারে নিজের নাক কাটিয়া পরের যাত্রাভঙ্গ!

কিছুদিন পরে চিত্তরঞ্জন এই রকম পণ্ডশ্রমের নিষ্ফলতা উপলব্ধি করিয়া ফরিদপুর প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সে নূতন নীতি গ্রহণের আভাস দিলেন; যদি তিনি ১৯২৬ পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিতেন, তবে যে তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিতেন তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ, ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে দেশবন্ধু মহাপ্রয়াণ করিলেন। সুতরাং কর্ম্মপদ্ধতি নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিবার মত শক্তিমান্ পুরুষ কেহ রহিল না; সেই মন্ত্রি-সংহার নাটকেরই re-hearsal চলিতে লাগিল, কংগ্রেস তরফ হইতে মাঝে মাঝে "সর্ব্বে নিষ্ক্রান্তাঃ" অর্থাৎ walk-out অভিনীত হইতে লাগিল। কিছুদিন পরে পুনরায় কংগ্রেস কর্ত্তৃক কাউন্সিল বয়কট হইল।

এমন সময়ে অর্থাৎ ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে সাইমন কমিশন নিযুক্ত হইল। লর্ড বার্কেন্‌হেড তখন ভারত সচিব, তিনি দুই বৎসর পূর্ব্বেই কমিশন বসাইলেন,

উদ্দেশ্য যে দশ বৎসরের মধ্যেই অর্থাৎ ১৯২৯এর মধ্যেই ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ভারত-শাসন আইন অনুযায়ী দশ-সালা সংস্কার যাহাতে সুসম্পন্ন হয়। এবিষয়ে বার্কেন্‌হেডের সঙ্কল্প সাধুই ছিল বলিতে হইবে, কারণ সেই উদ্দেশ্যানুযায়ী কাজ হইলে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দেই নব-শাসন-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত—যাহা হইয়াছে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে, অর্থাৎ আট বৎসর পরে। এই দেরীর জন্য কংগ্রেসই প্রধানতঃ দায়ী। কংগ্রেস ঘোষণা করিল যে সাইমন কমিশন বয়কট করিতে হইবে; অমনি দামামা বাজিয়া উঠিল, কৃষ্ণপতাকা-সহযোগে "Go back Simon"-এর দল রাস্তায় রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল।

কিন্তু এতাদৃশ দুর্ব্ব্যবহার সত্ত্বেও ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে কমিশন যে রিপোর্ট বাহির করিলেন তাহা মোটের উপর বেশ সন্তোষজনক। বস্তুতঃ ভারতের কেন্দ্রীয় শাসনে Federation-এর পরিকল্পনা এবং তদানুষঙ্গিক দ্বৈতশাসন ব্যতিরেকে বর্ত্তমান শাসন-তন্ত্র সাইমন রিপোর্ট হইতে পদমাত্রও অগ্রসর হয় নাই। কারণ সাইমন রিপোর্টে প্রদেশ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসন বিহিত হইয়াছিল, এখনও তদপেক্ষা বেশী কিছু পাওয়া যায় নাই। তাছাড়া সাইমন রিপোর্টে বিহিত হইয়াছিল, কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে ২৫০ জন সভ্যের মধ্যে ১৫০ জন সাধারণ নির্ব্বাচিত সভ্য, আর নব-শাসনতন্ত্রে বিহিত হইয়াছে ফেডারেল ব্যবস্থা-পরিষদে ৩৭৫ জন সভ্যের মধ্যে ১২৫ জন দেশীয় রাষ্ট্রের প্রতিনিধি, ৮২ জন মুসলমান, এবং মোটে ১০৫ জন সাধারণ নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি! এ ত গেল ক্ষমতা ও ব্যবস্থা-পরিষদের সভ্য-সংখ্যা সম্বন্ধে। সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্বন্ধে সাইমন কমিশন লক্ষ্ণৌ-প্যাক্টের বিধি সমর্থন করিয়াছিলেন; বিভিন্ন প্রদেশ সম্বন্ধে Boundary Commission-এর প্রস্তাব করিয়াছিলেন—সে প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে আজ লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালী মানভূম, সিংহভূম, শ্রীহট্টে বাঙ্গালার বাহিরে পড়িয়া থাকিত না।

কিন্তু এসব প্রস্তাব থাকিলে কি হয়? বয়কটের তখন পূরা দম চলিতেছে; তাই কংগ্রেস মহলে ঘোষণা হইল, Throw the Simon

Report into the waste-paper basket ! আর আজ ত Communal Award-এর চাপে জর্জ্জরিত হইয়া লোকে সাইমন কমিশনের সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের প্রতি করুণভাবে সতৃষ্ণ-নয়ন নিক্ষেপ করিতেছে। সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই সাইমন কমিশন বয়কট ব্যাপারে কংগ্রেসী নেতাদের সহিত লিবারেল কোম্পানীর কর্ত্তারাও যোগদান করিয়া কিঞ্চিৎ বাহবা অর্জ্জন করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

অথচ যদি সাইমন কমিশনের বিধান অনুসারে কাজ হইত, তবে সাত বৎসর পূর্ব্বে এই প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্ত্তিত হইত, এবং Communal Award-এর চাপে পড়িয়া ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতে হইত না; আর বিশেষতঃ বাঙ্গালার পক্ষে বলিতে গেলে, আজ সমগ্র বাঙ্গালী জাতি এক অখণ্ড বৃহত্তর বঙ্গদেশের মধ্যে বসবাস করিত। তাছাড়া, ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় শাসন-তন্ত্রেও আজ যে ফেডারেশনের অছিলায় ব্যবস্থা-পরিষদ্‌কে দেশীয় স্বেচ্ছাতন্ত্রী রাজন্যবৃন্দের মনোনীত ব্যক্তিদিগের দ্বারা ভর্ত্তি করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে—যাহারই বিরুদ্ধে আজ দেখিতে পাই জোয়াহির লাল বিস্তর চেঁচামেচি করিতেছেন—সে অবস্থারও উদ্ভব হইত না। সাইমন রিপোর্ট অনুসারে ব্রিটিশ-ভারতের শাসন-ব্যাপারে ব্রিটিশ-ভারতীয় প্রতিনিধিদেরই আধিপত্য থাকিত, অথচ নিখিল-ভারতীয় ব্যাপারে দেশীয় রাজন্যদিগের সহিত একযোগে যে সব ব্যাপার নির্ব্বাহ করা আবশ্যক তাহার জন্য "Greater India Council" প্রতিষ্ঠিত থাকিত। ফেডারেশনে যোগদান করাইবার জন্য আজ যে দেশীয় রাজন্যবৃন্দের নিরন্তর খোসামুদী চলিতেছে সে অশোভন ব্যাপারও ঘটিতে পারিত না।

যাহা হউক, কংগ্রেসী আন্দোলনে হিন্দু নেতৃগণের আস্ফালনে ত সাইমন রিপোর্টের পুঁথিগুলি বস্তাবন্দী হইয়াই রহিল, তৎপরিবর্ত্তে গড়াইয়া আসিল গোল-টেবিল। তাও প্রথম গোল-টেবিল কন্‌ফারেন্সেই একটা হেস্তনেস্ত

হইতে পারিত; কারণ বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রের যে দুইটা মোটা কথা—প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন এবং ফেডারেশন—এই দুইটি বিষয়ই সাপ্রু-রেডিং-বিকানীরের উদ্যোগে প্রথম গোল-টেবিলেই স্থিরীকৃত হইয়াছিল; সুতরাং কংগ্রেস-প্রতিনিধিগণ সেবারকার আলোচনায় যোগদান করিলে তখনই কার্য্য সমাধা হইতে পারিত। কিন্তু তাহাও হইল না। মৃদু-স্বভাব শান্তিকামী লর্ড আরুইন নিজে বিলাত গিয়া বিলাতী বড় কর্ত্তাদিগকে ধরিয়া পড়িয়া Dominion Status-এর আশ্বাসবাণী লইয়া আসিলেন—কিন্তু তাহাতে কংগ্রেসী কর্ত্তাদের মন উঠিল না, তাঁহারা গোঁসা করিয়া রহিলেন, গোল-টেবিলে গেলেন না। ইহাতে হইল আবার বৎসর খানেক নষ্ট। শুধু নষ্ট নয়, গান্ধীজী খামখা এক আইন-অমান্য আন্দোলন সুরু করিলেন। তৎফলে দেশময় ঘোরতর হৈ চৈ সুরু হইল; সন্ত্রাসবাদ—যাহা অনেকটা ঠাণ্ডা হইয়া আসিয়াছিল—তাহা আবার ভীষণভাবে জাগিয়া উঠিল; ফলে ধরপাকড় জেলে গমন; গান্ধী-প্রমুখ কংগ্রেসী নেতৃগণ আবার নির্ব্বিবাদে সব জেলে ঢুকিলেন। কিন্তু আরুইন হাল ছাড়িবার পাত্র নহেন; তিনি ঠিক করিলেন কংগ্রেসী দলকে গোল-টেবিলে পাঠাইয়া তবে ছাড়িবেন; সেই জেলেই- তিনি একযোড়া জবরদস্ত দূত সপ্রু-জয়াকরকে পাঠাইলেন, নিমন্ত্রণ-পত্র সমেত। তৎপরে, প্রথম গোল-টেবিলেরঅবসানের সময়ে, লিবারেল নেতাদের অনুরোধে কংগ্রেসী নেতাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল; লাট আরুইন গান্ধী মহাত্মার সহিত এক প্যাক্ট করিয়া কোনমতে তোড়জোড় করিয়া তাঁহাকে বিলাত পাঠাইয়া দিলেন।

সুরু হইল দ্বিতীয় দফা গোল-টেবিলের চংক্রমণ। সেবারকার কংগ্রেসী বাগাড়ম্বরের নিট্ ফল হইল এই যে, গান্ধীজী অনুন্নত শ্রেণীর প্রতিনিধি আম্বেদকরকে চটাইয়া ঘটাইলেন Minorities Pact, এবং করিয়া আসিলেন Communal Award-এর গোড়াপত্তন। আর একটি জিনিষের কিছু বাড়াবাড়ি হইল; কংগ্রেসী আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ বিধিবদ্ধ হইল বহুসংখ্যক safeguards বা রক্ষাকবচ। গোল-টেবিল হইতে ফিরিয়া আসিয়া

জোয়াহির লালের No-rent campaign-এর ধাক্কায় পড়িয়া মহাত্মাজী পুনরায় আইন-অমান্যের ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়িবার উপক্রম করিলেন; কিন্তু তখন জবরদস্ত লাট উইলিংডন দিল্লীর তক্তে সমাসীন, তিনি আর ফুরসৎ দিলেন না; হাতের অস্ত্র হাতেই রহিয়া গেল, গান্ধীজী গেলেন জেলে।

কিছুকাল পরে, হঠাৎ অর্থাৎ যথাসময়ে, ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে প্রসূত হইল সুবিখ্যাত Communal Award; দেশময় এই award-এ হিন্দুদিগের প্রতি অবিচারের বিরুদ্ধে বিষম আন্দোলন উঠিল। কিন্তু অতীব আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, award-এর প্রধান যে আপত্তি-জনক ব্যবস্থা হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক বণ্টন-ব্যাপারে, সে বিষয়ে গান্ধীজী কোন আপত্তি তুলিলেন না; আপত্তি তুলিলেন হিন্দু-সমাজের মধ্যে অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য যে ব্যবস্থা হইয়াছিল শুধু তাহার বিরুদ্ধে। জেলে বসিয়াই তিনি খাওয়া দাওয়া বন্ধ করিলেন; আবার তুমুল চাঞ্চল্য উঠিল দেশময়; হিন্দু-মুসলমান ব্যবস্থা ঘটিত যে প্রতিবাদ-আন্দোলন তাহা চাপা পড়িয়া গেল; গান্ধীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য Poona Pact স্বাক্ষরিত হইল। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট বলিলেন, তথাস্তু। এই পুণা প্যাক্টের দৌলতে এখন হিন্দু সমাজ দুই পরস্পর-বিসংবাদী দলে পরিণত হইয়াছে—এক "কাষ্ট" হিন্দু (Caste Hindu) বা বর্ণ-হিন্দু, অপর "আকাট" হিন্দু বা অবর্ণ হিন্দু। মহাত্মাজীর নেতৃত্বের ফলে এক নম্বর Communal Award, এবং দুই নম্বর Poona Pact উদ্ভূত হইয়া জাতিকে শতধা বিচ্ছিন্ন করিয়া পঙ্গু করিয়া ফেলিয়াছে। দ্বিতীয় গোল-টেবিলের ফল এই পর্য্যন্ত।

তারপর তৃতীয় গোল-টেবিল, জয়েণ্ট পার্লামেণ্টারী কমিটির রিপোর্ট, White Paper, তারপর পাকা Act, ক্রমশঃ ধীরে ধীরে নিয়ম-মাফিক হইতে লাগিল, এবং ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে নূতন ভারত-শাসনতন্ত্র বিধিবদ্ধ হইল। ১৯২৭ এ যাহার সুরু ১৯৩৫এ তাহার শেষ। দীর্ঘ আট বৎসরকাল এই ঝামেলাতে

গেল ; ফল যে সাইমন কমিশনের অতিরিক্ত এমন বিশেষ কিছু হইয়াছে তাহা ত দেখা যায় না।

ইতিমধ্যে গান্ধী মহাত্মার কিঞ্চিৎ ইতিহাস আছে। পুণা প্যাক্ট সমাধা করিয়াই তিনি একপ্রকার রাজনীতি ছাড়িয়া দিলেন এবং ধর্ম্মে দিলেন মন, অর্থাৎ হিন্দুধর্ম্ম সংস্কারে লাগিয়া গেলেন ; চিঠির পর চিঠি জেল হইতেই বাহির করিতে লাগিলেন, হিন্দু-মন্দিরের দ্বার অস্পৃশ্যদিগের জন্য উদ্ঘাটিত করিতে হইবে। এমন কি, কাউন্সিল-বয়কট-পন্থী হইয়াও তাঁহার চেলারা ব্যবস্থা-পরিষদে এক "মন্দির-প্রবেশ বিল" আনিলেন, যদিও তাহা শেষ অবধি টিঁকিল না। তারপর ঘটিল আর এক বিচিত্র ব্যাপার। আমেরিকান জনৈক রঙ্গিণী—যিনি ভারতে অবস্থানকালে নীলা নাগিনী আখ্যা ধারণ করিয়াছিলেন এবং কিয়ৎকাল মহাত্মাজীর চেলা সাজিয়াছিলেন—তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া সবরমতী আশ্রমে কিঞ্চিৎ আশ্রম-পীড়ার প্রাদুর্ভাব হইল ; সেই অনাচারের প্রায়শ্চিত্তকল্পে মহাত্মাজী আবার অনশন করিলেন ; সরকার বাহাদুর অবসর বুঝিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন ; গান্ধীজীও কৃতজ্ঞতাভরে আইন-অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করিলেন। নাগিনীর নাগপাশ-মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে ভারত-জননীও আইন অমান্যের কবল হইতে মুক্তি পাইয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন। কংগ্রেসী আন্দোলনের সম্পূর্ণ ব্যর্থতা এবং লাট উইলিংডনের সম্পূর্ণ সাফল্য যুগপৎ প্রকটিত হইল। কিছুকাল পরে, দেশ সম্পূর্ণরূপে ঠাণ্ডা হইলে, অনেক সাধ্য-সাধনার ফলে, কংগ্রেসকে অবৈধ-সমিতি বলিয়া যে ঘোষণা করা হইয়াছিল তাহা লাট উইলিংডন তুলিয়া দিলেন, এবং ব্যবস্থা-পরিষদের নির্ব্বাচনে কংগ্রেসকে আহ্বান করিলেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দ হইতে যে কংগ্রেস অবৈধ-আন্দোলনকেই একমাত্র কর্ম্মপন্থা নির্দ্দেশ করিয়া ছিল, সেই কংগ্রেসকে কনষ্টিট্যুশন্যাল পার্টিতে পরিণত করিয়া নূতন ভারত-শাসনতন্ত্র বিধিবদ্ধ করাইয়া উইলিংডন স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এই পর্য্যন্ত যাহা বর্ণিত হইল তাহাকে ঐতিহাসিক নাটক বলা যাইতে পারে ; অতঃপর এই বৎসর দেড়েক ধরিয়া যে সমস্ত অভিনয় কংগ্রেসী রঙ্গ-মঞ্চে হইতেছে তাহাকে কিন্তু প্রহসন ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না।

কংগ্রেসী মহলে স্থির হইল যে নূতন শাসনতন্ত্রকে বর্ণনা করিতে হইবে অতীব অসন্তোষজনক, ভারতবর্ষের পক্ষে অপমানজনক, ভারতে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্য দৃঢ়ীকরণের এক মহাস্ত্র-স্বরূপ—যেন ইতঃপূর্ব্বে কার্জ্জনীয় যুগে ভারতে ব্রিটিশ-শাসনের দৃঢ়তার কোন অভাব ছিল, এবং যেন ক্ষমতা ত্যাগ করাই ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করিবার অমোঘ প্রণালী ! স্থতরাং এই শাসন-তন্ত্রকে স্পর্শ করাও উচিত নহে, ইহাকে আমূলে ধ্বংস করিতে হইবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। অর্থাৎ অসহযোগ এবং আইন-অমান্য যুগের বোল্‌চাল্ পূরাদস্তুরই চলিতে লাগিল। কিন্তু মনে মনে সকলেই ঠিক করিয়া বসিয়া আছেন, আর নয়, আর অসহযোগের আত্মঘাতী পথে পা বাড়ান নয়, এবার ঘাঁটি দখল করিতেই হইবে। কিন্তু মুখে ত সে কথা বলা যায় না ; তাহা হইলে ত লোকে মডারেট, ধামাধরা, দেশদ্রোহী বলিয়া টিট্‌কারী দিবে ; তাই নানা রকম পাঁয়তারা কষা হইতে লাগিল।

প্রথমে রচিত হইল Constituent Assembly-র এক প্রকাণ্ড ধাপ্পা। দেশের জনসাধারণ দ্বারা নির্ব্বাচিত এক গণপরিষদ্ স্বাধীন ভারতের শাসন-সৌধের পরিকল্পনা করিবে ; বিদেশীর দান হিসাবে স্বরাজের খসড়া আমরা গ্রহণ করিব ? কদাপি ন। এবম্প্রকার লম্বাই চওড়াই বুলির সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আসল কাজও আস্তে আস্তে চলিতে লাগিল। কংগ্রেস-কমিটি স্থির করিলেন যে, কাউন্সিলগুলি দখল করিতে হইবে। কেন ? Reforms work করিবার জন্য অবশ্যই নয়। আরে রামঃ শ্রীবিষ্ণু, তাও কি কখন হয় ? শুধু দেশদ্রোহী খয়েরখাঁর দল ঐ ঘাঁটিগুলি আগলাইয়া না বসিতে পারে সেই জন্য। দ্বিতীয়তঃ আস্তে আস্তে উঠিল মন্ত্রিত্ব-গ্রহণের প্রস্তাব। কিষ্কিন্ধ্যার সত্যমূর্ত্তি আর পেটে ক্ষুধা মুখে লাজ অবস্থায় থাকিতে পারিলেন

না ; তিনি স্পষ্টই বলিয়া ফেলিলেন, মন্ত্রিত্ব চাই। এবং খুবই আশ্চর্য্যের বিষয় যে স্বয়ং গান্ধীর দল—মহাত্মাজীর বৈবাহিক রাজগোপালাচারী হইতে আরম্ভ করিয়া বল্লভ সর্দ্দার পর্য্যন্ত প্রাচীন যুগের no-changer দল অর্থাৎ চিত্তরঞ্জন-বিরোধী দল—তাঁহারাই মন্ত্রিত্বের দিকে ভিড়িলেন। বিরুদ্ধতার অভিনয় করিলেন, কংগ্রেসের নয়া আমদানী সোশ্যালিষ্ট দল জোয়াহির লালের নেতৃত্বে। আসন্ন নির্ব্বাচন-সমরের মুখে ঠিক হইল যে মন্ত্রিত্ব-গ্রহণ সম্বন্ধে স্পষ্ট কিছু বলা সুবিধা নয় ; সুতরাং Communal Award সম্বন্ধে যেরূপ "neither accept nor reject" নীতি অবলম্বিত হইয়াছিল, মন্ত্রিত্ব-গ্রহণ বিষয়েও সেইরূপ ন যযৌ ন তস্থৌ গোছ তূষ্ণীভাব অবলম্বন করা হইল, কারণ বোবার শত্রু নাই। এবং নির্ব্বাচন সমাধা না হওয়া পর্য্যন্ত wrecking the Reforms-এর তর্জ্জন-গর্জ্জন খুবই শুনা যাইতে লাগিল।

নির্ব্বাচনের পরে ধীরে ধীরে সুর বদলাইতে লাগিল। সত্যমূর্ত্তি রাজগোপালাচারীর দল ক্রমশঃই মুখর হইয়া উঠিতে লাগিল, এবং স্পষ্টই বুঝা যাইতে লাগিল যে দেশের জনমত আর কোনমতেই নিষ্ফল অসহযোগের ধান্দায় ঘুরিতে চাহে না। জোয়াহিরলাল ও তস্য সোশ্যালিষ্ট চমূর লম্ফ ঝম্প দেখা যাইতে লাগিল বটে, কিন্তু তাহাতে যেন ভাল করিয়া আসর জমিল্লনা। সুতরাং মন্ত্রিত্ব-ভার যে গ্রহণ করিতেই হইবে, ইহা একরূপ স্থির নিশ্চয় হইল। কিন্তু কোন্ মুখে গ্রহণ করা যায়, এত শাসনতন্ত্র-বিনাশ বা wrecking-এর তর্জ্জন-গর্জ্জনের পর ? এই লজ্জার বাঁধই ত চৌদ্দ বৎসর পূর্ব্বে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ভাঙ্গিতে পারেন নাই। সুতরাং কোন প্রকারে কোন না কোন ফন্দিতে মুখরক্ষা করা যায় কিনা তাহাই একমাত্র ভাবিবার বিষয় হইল।

কংগ্রেসী দল হইতে মহাত্মাজীর নিকট ধর্ণা দেওয়া হইল, দোহাই কর্ত্তা, আপনি একটা formula বাঁধিয়া দিন ত, যাহাতে সাপও মরে লাঠিও না ভাঙ্গে। মহাত্মাজী বলিলেন, আমি ত রাজনীতি ছাড়িয়াই

দিয়াছি, কংগ্রেসও ছাড়িয়া দিয়াছি, এমন কি চারি-আনা চাঁদা-দাতা কংগ্রেসী সভ্যও আমি নহি, তবে তোমরা যখন ধরিয়াছ তখন adviser বা পরামর্শদাতা হিতৈষী হিসাবে আমি তোমাদিগকে এই সমূহ বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিবার বিধিমত চেষ্টা করিব, একটা যা হউক কিছু বাহির করিবই। এবং অতঃপর নিজের কথামত inner voice-এর সহিত পরামর্শ করিয়া এক formula বা মন্ত্র আবিষ্কার করিলেন; বলিলেন ব্রিটিশ সরকারকে যে, হাঁ, আমরা তোমাদের মন্ত্রিত্ব স্বীকার করিতে রাজী, তবে তোমরা মুচলেকা লিখিয়া দেও, assurance দেও যে কোন বিষয়ে মন্ত্রীদের কথার উপর তোমাদের লাট সাহেবেরা একটিও কথা কহিতে পারিবে না।

এই মন্ত্র ঝাড়িবার পর আরম্ভ হইল বেজায় রগড়। ভারত-সচিব লর্ড জেট্‌ল্যাণ্ড (পূর্ব্বতন বাঙ্গলার লাট রোণাল্‌ড্‌শে) বিলাত হইতে ঘোষণা করিলেন, আইনতঃ এ প্রকার কোন প্রতিশ্রুতি দেওয়া চলে না, এবং আইন বহির্ভূত কোন কিছু করিতে ব্রিটিশ সরকার প্রস্তুত নহেন; তবে ভারত শাসন-সংস্কারের মূলগত অভিপ্রায়ই এই যে, সচরাচর মন্ত্রীদিগের কার্য্য-কলাপের উপর হস্তক্ষেপ করা হইবে না, তবে বিশেষ অবস্থার উদ্ভবে বিশেষ ক্ষমতার প্রয়োগ আবশ্যক হইলে করিতেই হইবে। ইহাতে কংগ্রেস ইচ্ছা হইলে আসিতে পারেন, ইচ্ছা না হইলে না আসিতে পারেন। তবে ব্রিটিশ সরকার ইচ্ছা করেন যে, সমস্ত প্রদেশের যে সমস্ত রাজনৈতিক দল প্রতিনিধি হিসাবে সংখ্যাভূয়িষ্ঠ তাহারা তত্তদ্দেশের শাসনভার গ্রহণ করুক। এই শাসনভার দেশের প্রতিনিধিদিগের হস্তে অর্পণ করিবার জন্যই ত নবশাসন তন্ত্রের পরিকল্পনা।

জেট্‌ল্যাণ্ডের এই স্পষ্টবাক্যে বড় মুস্কিল হইল; মান-ভঞ্জনের সুবিধা হইল না। নানা পক্ষের নানা আইন-বিশারদের ব্যাখ্যা বিবৃতিতে কাণ ঝালাপালা হইতে লাগিল। এদিকে কংগ্রেসী-পক্ষের সুর

ক্রমশঃই নামিতে লাগিল, assurance-এর বহর কমিতে লাগিল। শেষে গান্ধীজী বলিলেন, আচ্ছা আইনে যদি ওরকম প্রতিশ্রুতির কথা নাই থাকে তবে দরকার নাই ঐরূপ প্রতিশ্রুতির, কিন্তু মন্ত্রিমণ্ডলের সহিত যদি লাট সাহেবের মতভেদ উপস্থিত হয়, লাটসাহেব যেন মন্ত্রীদিগকে তাড়াইয়া দেন অর্থাৎ dismiss করেন, মন্ত্রিগণকে যেন পদত্যাগ করিতে অর্থাৎ resign করিতে বলেন না। আত্মসম্মানের অদ্ভুত মহাত্মীয় ব্যাখ্যা বটে—পদত্যাগ অপেক্ষা বিতাড়নই কাম্যতর!

যাহা হউক, ইহাতেও ব্রিটিশ সরকার রাজী হইলেন না; কিন্তু নূতন বড়লাট লিনলিথগো প্রকাণ্ড একটি বিবৃতি প্রকাশ করিলেন, এবং তাহাতে বলিলেন, কংগ্রেসের এই সমস্ত দাবী একেবারেই অযৌক্তিক এবং অনাবশ্যক, কারণ এই রকম মতভেদের উৎপত্তি ত সচরাচর ঘটিবার কথা নহে, এবং উভয় পক্ষই যদি পরস্পরের মনোভাব বুঝিয়া শুভেচ্ছা ও সহানুভূতির সহিত কার্য্য করে, তবে হয়ত কদাচিৎ এরূপ অবস্থার উদ্ভব হইতে পারে, ইহা লইয়া এত কচ্‌কচির প্রয়োজন কি? পূর্ব্বেই ত বলা হইয়াছে, এবং আইনেই ত রহিয়াছে যে সচরাচর মন্ত্রিমণ্ডলের মত দ্বারাই লাটসাহেব চালিত হইবেন, তাঁহারাই ত দেশের শাসন কার্য্য চালাইবেন; কাজের উদার প্রশস্ত ক্ষেত্র রহিয়াছে, দেশের অবস্থার উন্নতির জন্য এত কাজ করিবার রহিয়াছে, দেশের প্রতিনিধিগণ তাহাই অবিলম্বে আরম্ভ করিয়া দিউন। তবে তাহা না করিয়া যদি কচ্‌কচি ও অসহযোগের পন্থাই তাঁহারা অবলম্বন করা শ্রেয়ঃ মনে করেন, তবে তিনি তাহার উচিত দাওয়াই প্রয়োগ করিবেন।

গোব্রাহ্মণ-হিতাকাঙ্ক্ষী নয়া বড়লাট সাহেবের এই উক্তির পরে কংগ্রেসী দল দেখিলেন যে লেবু কচ্‌লাইতে কচ্‌লাইতে তিক্ত হইয়া গিয়াছে, আর কচ্‌কচিতে দরকার নাই। সুতরাং সিদ্ধান্ত হইল, আচ্ছা, ব্রিটিশ সরকার প্রতিশ্রুতি না দিলেন, না-ই দিলেন, ভদ্রলোকের

মত কথা বলিয়াছেন ত ? এই যথেষ্ট হইয়াছে—আবার কি চাই ? এখন একদিন শুভক্ষণ দেখিয়া মন্ত্রী হইয়া বসা যাউক—বিলম্বেনালম্। অতঃপর স্মরণীয় ১৪ই জুলাই তারিখে কংগ্রেস তরফ হইতে মন্ত্রীর আসন অধিকৃত হইল নানা প্রদেশে। হঠাৎ গান্ধীজী আবিষ্কার করিলেন যে এই শাসনতন্ত্র দ্বারা অনেক সৎকার্য্য করা সম্ভব—অথচ বিগত এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত ইহা একেবারে অকেজো বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল। কংগ্রেসী অভিধানে "wrecking"-এর অর্থ দাঁড়াইল "working," "wholly unacceptable"-এর অর্থ দাঁড়াইল "partly acceptable"! অবশ্য কবির ভাষায় বলিতে গেলে, অমন অবস্থায় প'ড়লে সকলেরই মত বদলায়। যাহা হউক, মান-অভিমানের পালা সাঙ্গ হইল—ভারতের বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে এক বিচিত্র করুণ অঙ্কে যবনিকা-পতন হইল।

কাজেই দেখা যাইতেছে যে আজ জুলাই মাসে কংগ্রেস-কর্ত্তৃক অথবা জনসাধারণের প্রতিনিধি-কর্ত্তৃক রাজ্য-শাসনভার গ্রহণ করাতে যে দম্ভ বা আত্মশ্লাঘা বা ঢক্কানিনাদ দেখা দিয়াছে, তাহার হেতু অতি অল্পই আছে। বহু বৎসর পূর্ব্বেই এই অবস্থার উদ্ভব হইতে পারিত; সতের বৎসর পূর্ব্বেই আংশিকভাবে এই অবস্থা হইতে পারিত—মণ্টেগু-সংস্কারের দ্বৈত-শাসনের যুগে। আর এই পূর্ণতর স্বায়ত্ত-শাসনও এত গণ্ডগোল হৈ চৈ আইন-অমান্য আন্দোলন প্রভৃতি না হইলে অন্ততঃ সাত বৎসর পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত; শুধু গান্ধীর দ্বারা বিপথে পরিচালিত হওয়াতেই জাতির এতটা অমূল্য সময় নষ্ট হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা উঠিতে পারে যে, এই আন্দোলনে শাসন-সংস্কার বিষয়ে কোন সুফল না হইয়া থাকিতে পারে, এমন কি ইহা দ্বারা সংস্কারের বিলম্বও ঘটিয়া থাকিতে পারে; কিন্তু তাই বলিয়া কি বলিতে হইবে যে আন্দোলন একেবারেই ব্যর্থ হইয়াছে? ইহা দ্বারা কি দেশে একটা নব-জাগরণ হয় নাই ? ইহার উত্তর অতি সহজ। কোন বিরাট্ ব্যাপক জাতীয় আন্দোলনই

কখনও একেবারে নিরর্থক হইতে পারে না, বিশেষতঃ তাহা যদি মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন তেজস্বী নেতাদ্বারা পরিচালিত হয়। দেশে জাতীয় স্বাধীনতা-প্রচেষ্টা মাত্রেরই একটা সার্থকতা আছে ; কিন্তু সে সার্থকতা কোন বিশিষ্ট একটা প্রণালীর উপর নির্ভর করেনা ; নানাবিধ প্রণালীতেই জাতীয় আন্দোলন সার্থক হইতে পারে, জাতীয় জীবনকে জাগরিত করিতে পারে, জাতীয় চেতনাকে স্পন্দিত করিয়া তুলিতে পারে—যদি তাহার পশ্চাতে একাগ্রতা, নিষ্ঠা, এবং অকুতোভয়তা থাকে। কিন্তু সেই আন্দোলন যে বর্জ্জন-নীতি-মূলক কিংবা অসহযোগ-নীতি-মূলকই হইতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে স্বদেশীর যুগে সুরেন্দ্রনাথ-বিপিনচন্দ্র-অরবিন্দ-অশ্বিনীকুমার-শ্যামসুন্দরের নেতৃত্বে বাঙ্গালায় যে শক্তি সঞ্চার হইয়াছিল তাহা অসহযোগ-নীতিতে হয় নাই, অন্য উপায়ে হইয়াছিল। মদনমোহন-লাজপত-তিলক বঙ্গের সেই আগুন হইতে এক স্ফুলিঙ্গ লইয়া সারা ভারতবক্ষে যে আগুন জ্বালাইয়াছিলেন তাহাও অসহযোগ-নীতিতে হয় নাই, অন্য উপায়ে হইয়াছিল। এমন কি সেদিনও বাঙ্গালার চিত্তরঞ্জন অসহযোগের ব্যর্থতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া স্বরাজের যে নূতন কর্ম্মপন্থা আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহাতেও জাতীয় জাগরণ বাড়িয়াছিল বই কমে নাই। আর আজ জাতীয় প্রতিনিধিগণ-কর্ত্তৃক শাসনতন্ত্র পরিচালনার ফলে নানাদিকে নানাভাবে যে নূতন কর্ম্মপন্থা প্রবর্ত্তিত হইবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে তাহাতেও জাতীয় শক্তি বাড়িবে বই কমিবে না। তাই বলিতেছিলাম, কোন বিশিষ্ট formula বা প্রণালী জাতীয় আন্দোলনের সার্থকতার মূলীভূত কারণ নহে, সার্থকতার মূলীভূত কারণ তেজস্বিতা ও মুক্তিপিপাসা। তেজস্বী মুক্তিকামী নেতৃগণ-কর্ত্তৃক পরিচালিত যে কোন প্রণালীর জাতীয় আন্দোলনই আজিকার জাতীয় জাগরণ আনয়ন করিতে পারিত। অথচ গান্ধীবাদ ও অসহযোগ যে শক্তির অপচয় ও নিরর্থক যন্ত্রণা ঘটাইয়াছে, যে কালক্ষয় ব্যর্থতা ও বিকৃতি আনয়ন করিয়াছে, তাহা ঘটিবার কোন অবকাশ থাকিত না।

এই ব্যর্থতা ও বিকৃতির কথা আজ বাঙ্গালাদেশে থাকিয়া স্বতঃই মনে পড়ে। আজ যখন ভারতের নানা প্রদেশে জাতীয়তাবাদী মন্ত্রিগণ নানাভাবে নানাদিকে কর্ম্ম-প্রচেষ্টা আরম্ভ করিবার প্রয়াস পাইতেছেন, স্বরাজের নিমন্ত্রণ-সভা যখন চারিদিকে "দীয়তাং" "ভুজ্যতাং" রবে মুখরিত, তখন বাঙ্গালা কোথায়? সে নিমন্ত্রণ-সভায় বাঙ্গালার ত কোন স্থান দেখিতেছি না। এ যেন একেবারে "The Play of Hamlet without the Prince of Denmark!" যে বাঙ্গালাদেশ আজ সার্দ্ধ-শতাব্দী ধরিয়া ভারতের গণ-জাগরণের শব-সাধনা করিয়াছে, যে বাঙ্গালা দেশের শক্তি-উৎস হইতে তেজোধারা ক্রমশঃ সমগ্র ভারতবর্ষে প্রসৃত হইয়া গোটা হিন্দুস্থানকেই তরঙ্গিত করিয়া তুলিয়াছে, আজ যখন সেই শব-সাধনার সিদ্ধি করতলগত প্রায়, তখন সে বাঙ্গালা দেশের ত কোন হদিস্ পাওয়া যাইতেছে না। Communal Award-এর চাপে সেই বাঙ্গালার জাতীয়তা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রাণ ওষ্ঠাগত-প্রায়—এবং এই সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত গান্ধী-আন্দোলনেরই বিষময় ফল। শাসন-তন্ত্রের এই বিষম বিকৃতির কোন কারণই ঘটিত না, কংগ্রেস-পরিচালিত হিন্দু আন্দোলন যদি বিপথে না যাইত। আজ সেই সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত এবং তদুপরি পুণা-প্যাক্টের দাপটে জাতীয়তাবাদী বঙ্গভূমি মূর্চ্ছিতপ্রায়। তাই আজ যে "আনন্দমঠ" দেশে জাতীয় আন্দোলনের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, সেই অমর গ্রন্থের বহ্ন্যুৎসব বাঙ্গালার বক্ষে হইতেছে; ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের যে "বন্দে মাতরম্" মন্ত্র সমগ্র হিন্দুস্থানের মুক্তি-সাধনার জপমন্ত্রে পরিণত হইয়াছে, সেই মন্ত্র আজ বাঙ্গালাদেশে নিষিদ্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। অপরং কিংবা ভবিষ্যতি? যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। মহাত্মা গান্ধীকী জয়!

আশ্বিন, ১৩৪৪

ঐক্যের আলেখ্য

ঐক্যের আলেয়া

এই সেদিন সকালবেলা খবরের কাগজখানা খুলিয়াই হঠাৎ দৃষ্টি পড়িল একটি বিচিত্র সংবাদের প্রতি—মধ্য-ভারতীয় "সেনাপতি" প্রাচ্য-ভারতীয় "রাষ্ট্রপতি"র নিকট একখানি তাড়িতবার্ত্তা প্রেরণ করিয়াছেন এই মর্ম্মে যে, যবন-দলপতি উত্তর-ভারত হইতে যে সমস্ত মিলনের সর্ত্ত প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা অবিলম্বে মানিয়া লওয়া হউক, এমন কি তাঁহার মনে মনে যদি আরও কোন দাবী-দাওয়া থাকে তাহাও পূরণ করা হউক। সেনাপতি-রাষ্ট্রপতির দঙ্গল ঠেলিয়া খবরটার ভিতরে কোন মতে প্রবেশ করিয়া দেখি যে ব্যাপারটা এই। শুনা যায় যে দিল্লী হইতে মিঃ জিন্না জোয়াহির পণ্ডিতকে জানাইয়াছেন যে মস্লেম-লীগ এখন আর পূর্ব্বতন চতুর্দ্দশপদী দাবীতে রাজী নহেন, এখন তাঁহারা অন্ততঃ তে-সাতে একুশ পদের অন্নব্যঞ্জন দ্বারা পরিবেশনের দাবী করেন; এই সংবাদে উচাটন হইয়া নাগপুর হইতে মিঃ বাপাট একেবারে হন্তদন্ত ভাবে টেলিগ্রাফ

করিয়াছেন কলিকাতার মিঃ স্থভাষ বস্থকে, তিনি যেন অবিলম্বে জিন্না সাহেবকে জানাইয়া দেন যে একুশ ত কোন্ ছার, যদি একুশ দশে দু'শ' দশ দফাও লীগ দাবী করেন, তাহাও তিনি দিতে রাজী—তবে কিনা একটা সর্ত্ত আছে, সেনাপতি-রাষ্ট্রপতির কংগ্রেস-বাহিনী ব্রিটিশদিগের বিরুদ্ধে যে প্রকাণ্ড স্বাধীনতা-সমর চালাইতেছেন তাহাতে কিন্তু লীগের ঝম্প প্রদান করিতে হইবে। স্বামী বিবেকানন্দ একদা গাহিয়াছিলেন, "দাও দাও আর ফিরে নাহি চাও" ; আমাদের দিল্-দরিয়া কংগ্রেস-দলপতিগণ দেখি উদারতায় স্বামীজীকেও ছাড়াইয়া গেলেন।

আরও একটা বড় খবর চোখে পড়িল। আমাদের সেই চাংড়িপোতার নরেন ভট্চাজ্, অধুনা ওরফে মিঃ এম্. এন্. রয়—বিশ্ববিশ্রুত প্রচণ্ড সাম্যবাদী—জাগ্রৎ সাম্যবাদের দেশ-সমূহ সম্ভবতঃ অত্যুষ্ণ বোধ হওয়াতে যিনি অবশেষে এই শান্তরসাস্পদ ভারতবর্ষের স্থশীতল ক্রোড়ে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছেন—তিনি তাঁহার স্বদেশের বৈষম্য-জর্জ্জর অবস্থা অবলোকনে নিরতিশয় ব্যথিত হইয়া এক দফা ফতোয়া বাহির করিয়াছেন। তিনি সাম্যবাদী কিনা —কাজেই তিনি হিন্দুও নহেন মুসলমানও নহেন—পরন্তু এতদুভয়ের অনেক ঊর্দ্ধলোকে অবস্থান করেন। তাই তিনি দরাজ গলায় ঘোষণা করিয়াছেন, এ সব কি ছার খিটিমিটি? মুসলমানেরা যাহা চায় তাহা দিয়া দিলেই হয়—এই সামান্য ব্যাপার লইয়া এত কোন্দল-কলহ টানা-হ্যাঁচড়া কেন? আসলে হিন্দুদিগেরই দোষ, তাহারাই প্রতিক্রিয়াশীল অর্থাৎ re-actionary, বুর্জোয়া-মনোভাব-সম্পন্ন এবং প্রচ্ছন্ন সাম্রাজ্যবাদপন্থী। কম্রেড রয় যে এই কুসংস্কারাচ্ছন্ন হীনমতি পঁচিশকোটি হিন্দুকে সরাসরি ইস্লামের স্থশীতল ছায়ায় সমবেত হইতে বলেন নাই—ইহাই পরম আশ্চর্য্যের বিষয়।

তারপর, আমাদের ভারতবর্ষের অতিমানব—মহাত্মা গান্ধী—তিনি ত রহিয়াছেনই। হঠাৎ একটা গণ্ডগোল উপস্থিত হইলেই তাঁহার চিত্তস্থৈর্য্য টুটিয়া যায়; বিশেষতঃ যদি কোন একটা রক্তারক্তি ব্যাপার ঘটে, তবে

ত কথাই নাই; অহিংসামন্ত্র সহযোগে তিনি যে নবীন মহাভারত গড়িয়া তুলিতে প্রয়াস পাইতেছেন এই সতের বৎসর ধরিয়া, সেই মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া যায়; সুতরাং ঐক্যের তাড়না তাঁহাকে পাইয়া বসে। এই সেদিনকার হোলি-মহরম ঘটিত কাশী-প্রয়াগের দাঙ্গাতেও এই রকম ব্যাপারটিই ঘটিয়াছে। তিনি একেবারে অধৈর্য্য হইয়া বলিয়া উঠিয়াছেন, এ কি হইল? আমি সতের বৎসর ধরিয়া ভারতের উর্ব্বর ক্ষেত্রে অহিংসার চাষ করিলাম, আর ফলিল কিনা রক্তবীজের গোষ্ঠী! সতেরটা বচ্ছর একেবারে মাঠেই মারা গেল—We have lost precious 17 years! না:, ইহার একটা বিহিত করিতেই হইবে। আন দেখি চেক-বইখানা—এবার জিন্না সাহেবের নামে আর একখানা বড় দেখিয়া blank cheque সই করিয়া দিই। মহাত্মাজীর অবস্থা কি রকম জানেন? এক একজন লোক থাকে যে কিছুতেই অস্ত্রোপচার দেখিতে পারে না, কি রকম যেন nervous reaction হয়—আমাদের অতিমানবও সেই দল-ভুক্ত। রক্তপাত হইয়াছে কি—অমনি হয় pact, নয় fast! তাই কয়েকদিন যাইতে না যাইতেই দেখি আমাদের মহাত্মাজী মালাবার হিলে গিয়া শ্রীজিন্নার মন্দির-দ্বারে ধর্ণা দিতেছেন, নূতন এক দফা প্যাক্টের ধান্দায়; এবং তাঁহারই আজ্ঞাবহ হইয়া সুশীল সুবোধ বালকের ন্যায় আমাদের নবীন রাষ্ট্রপতিও unity file বগলে করিয়া সেই পুণ্যতীর্থে খুবই আনাগোনা করিতেছেন।

আমাদের নেতৃকুলের এবংবিধ আকুলি-বিকুলি দর্শনে ইতরজনের ধৈর্য্যরক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠে। ঐক্য চাই, ঐক্য চাই, যেন তেন প্রকারেণ ঐক্য আনিতেই হইবে, তজ্জন্য যদি জাতীয় আদর্শ বলি দিতে হয় তাহাও স্বীকার—একেবারে unity at any price! আমাদের হিন্দু নেতৃগণের এই ঐক্য-mania আজকালকার ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেন সাহেবের রাষ্ট্রনীতিকেই স্মরণ করাইয়া দেয়—শান্তি চাই, শান্তি চাই, যেন তেন প্রকারেণ শান্তি রাখিতেই হইবে, তজ্জন্য যদি জাতীয় সম্মান বিসর্জ্জন দিতে হয় তাহাও

স্বীকার—peace at any price! চেম্বারলেনের রাষ্ট্রনীতি যেমন ভ্রান্ত রাষ্ট্রনীতি—ইহাতে জাতীয় সম্মানও বজায় থাকে না, শান্তিও অব্যাহত থাকে না—তেমনই গান্ধী-রয়-বাপাটের ঐক্য-নীতিও ভ্রান্ত ঐক্য-নীতি—ইহাতে জাতীয় আদর্শও বজায় থাকে না, ঐক্যও সম্ভাবিত হয় না। এই সহজ কথাটা আমাদের নেতাদের মাথায় কেন যে ঢুকে না, তাহা সত্যই বুঝা বড় শক্ত। ইউরোপে যাহা ঘটিতেছে ভারতেও তাহারই কতকটা পুনরাবৃত্তি ঘটিতেছে। ইউরোপে বলদৃপ্ত ক্ষাত্রগুণোপেত ডিক্টেটর-বৃন্দ বুঝিয়া লইয়াছে যে শান্তি-বিলাসী জাতিগুলি যতই চেঁচামেচি করুক, শেষ পর্য্যন্ত লড়াই কিছুতেই করিবে না, সুতরাং তাহারা ক্রমশঃই তাহাদের সুর চড়াইতেছে এবং কার্য্য হাঁসিল করিতেছে। ঠিক তেমনই ভারতবর্ষে কূটবুদ্ধি মুসলমান নেতৃবৃন্দ ঠাহর করিয়া লইয়াছে যে ঐক্যের নামে হিন্দুগণ সব কিছু জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত, সুতরাং তাহারাও দর বাড়াইতেছে এবং ঝোপ বুঝিয়া কোপ মারিতেছে। ইহা ত অবশ্যম্ভাবী। এই defeatist পন্থা দ্বারা, এই প্রকার আত্মসমর্পণ দ্বারা শান্তিও সংরক্ষণ করা যায় না, ঐক্যও সাধন করা যায় না।

বস্তুতঃ ঐক্য-প্রচেষ্টার জন্য এই যে সব মর্ম্মান্তিক ছট্‌ফটানি, ইহার পশ্চাতে অনেকখানি confusion of thought, চিন্তার জড়তা আছে—তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা দরকার। কোন্‌টা যে উপায় কোন্‌টা যে উদ্দেশ্য, কোন্‌টা means এবং কোন্‌টা end, এই সম্বন্ধে তালগোল পাকাইয়া যাওয়াতেই এই সমস্ত অপচেষ্টার উদ্ভব। ইহার উপর আর একটি উৎপাত দাঁড়াইয়াছে—tyranny of phrases—ভাষালঙ্কারের মোহ। উপমা ও উৎপ্রেক্ষা, metaphor ও simile দ্বারা যুক্তিধারার স্বচ্ছতা আবিল হইয়া উঠিয়াছে। বাপাট সাহেব একটা অলঙ্কার প্রয়োগ করিয়াছেন—ইংরাজদিগের সঙ্গে যে ভীষণ স্বাধীনতা-সমরে আমরা লিপ্ত হইয়াছি তাহাতে মুসলমানগণ ঝাঁপ দিয়া পড়ুন। এই অলঙ্কারটির প্রয়োগ অহরহই দেখিতে

পাওয়া যায়। শুনিতেও শুনায় মন্দ না। ইংরাজদিগের যেন পাঁচ লক্ষ সৈন্য রহিয়াছে; হিন্দুরা লাখ তিনেক যোগাড় করিয়াছে রাষ্ট্রপতি প্রভৃতির উদ্যোগে; আর লাখ দুই যদি জিন্না সাহেব mobilise করিয়া আনিতে পারেন, তবে চাই কি, পাণিপথের চতুর্থ যুদ্ধ আমরা ফতে করিয়া ফেলিতেও পারি। সুতরাং এই লাখ দুই লোক যে বেতন চায় তাহাই দেওয়া যাউক—মিছামিছি দর-কষাকষি করিয়া আসন্ন সময়ে আত্মহত্যা করা কেন? ইহা বেশ সহজ সোজা কথা—ঐক্য হইল উপায়, বিজয়লাভ হইল উদ্দেশ্য। কিন্তু গোড়ায় গলদ হইল—এ সবই যে রূপক। কোথায় বা পাঁচ লাখ সৈন্য, কোথায় বা পাণিপথ? অহিংসার যুগে ত ওসব অচল। যাহা হইতেছে তাহা যে নেহাৎই নিরামিষ ব্যাপার।

বছর সতের পূর্ব্বে ইংরাজ ভারতবর্ষকে এক প্রস্থ শাসন-সংস্কার দ্বারা কতকটা স্বায়ত্ত-শাসন দিয়াছিল; তারপর অনেক সলা-পরামর্শ, অনেক সভা-সমিতি, অনেক কমিশন গোল-টেবিল করিবার পর বছর তিনেক হইল আর এক দফা শাসন-সংস্কার দ্বারা আরও পূর্ণতর স্বায়ত্তশাসন দিয়াছে। সেই নূতন প্রণালী দেশে চল্‌তি হইয়া গিয়াছে—এমন কি যুযুধান রাষ্ট্রপতির দলও কিঞ্চিৎ বাক্যব্যয়ের পর সেই শাসন-সংস্কারের মূলেই নানা প্রদেশে শাসন-ভার গ্রহণ করিয়াছেন—বেশ নিরিবিলি নিরুদ্বিগ্ন ভাবে দেশের কাজকর্ম্ম চলিতেছে। অন্যান্য প্রদেশে অন্য দল শাসন কার্য্য চালাইতেছেন, তাহাও বেশ মোটামুটি শৃঙ্খলার সহিতই চলিতেছে। পাণিপথ কোথায়? সে যে "সেনাপতি" বাপাটের নিশীথের দুঃস্বপ্ন মাত্র। এই শান্তিপূর্ণ অবস্থার মধ্যে যুদ্ধের বোলচাল যে একেবারেই figure of speech বা ভাষালঙ্কার মাত্র। এস্থলে ত দুই লাখ তিন লাখে মিলিয়া পাঁচ লাখ হয় কিনা সে প্রশ্নই উঠিতেছে না। কাজেই আসন্ন বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য ঐক্যই একমাত্র উপায়, একথার এস্থলে কোন অর্থই হয় না—কারণ আসন্ন কোন বিপদ্ নাই। এবং এদেশে যে রাজনৈতিক পন্থা কি কংগ্রেস কি

লিবারেল কি মুসলমান দ্বারা অনুসৃত হইতেছে, সে পন্থা মাথা গুণ্‌তির দ্বারা মারামারির ফৌজ সংগ্রহ করিবার পন্থা নহে—সুতরাং এবংবিধ আলোচনা একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক।

আর শুধু যে আজই আমাদের দেশে এই অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে তাহা নহে। সিপাহী-বিদ্রোহের পর যত ব্যাপক রাজনৈতিক আন্দোলন এদেশে হইয়াছে সবই মোটামুটি নিরুপদ্রব ও অহিংস ভাবেই হইয়াছে, সশস্ত্র বিদ্রোহের আকার ধারণ করে নাই। বাঙ্গালার সন্ত্রাসবাদ ও পঞ্জাবের বিপ্লব ব্যতিক্রম মাত্র—এবং ইহারাও দেশব্যাপী আন্দোলনের আকার ধারণ করে নাই। একটু ইতিহাসই আলোচনা করা যাউক।

প্রথম দেশব্যাপী আন্দোলন ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে প্রবর্ত্তিত স্বদেশী আন্দোলন। সে আন্দোলনে বাঙ্গালার হিন্দুরাই যোগদান করিয়াছিল, মোটামুটিভাবে মুসলমানগণ করে নাই, অন্যান্য প্রদেশও বিশেষ যোগদান করে নাই—কিন্তু সে আন্দোলন সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। লোক-সংখ্যার মুষ্টিমেয়তা আন্দোলনকে ব্যাহত করে নাই। তারপর বিপরীত দৃষ্টান্ত ধরা যাউক। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে গান্ধী-প্রবর্ত্তিত অসহযোগ আন্দোলন; সে আন্দোলনের সঙ্গে খিলাফৎ আন্দোলনের যোগাযোগ করিয়া মহাত্মা গান্ধী হিন্দু মুসলমানের মধ্যে একটা জোড়া-তাড়া ঐক্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এবং সমগ্র ভারতবর্ষেই সে আন্দোলনের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল, অথচ সে আন্দোলন ব্যর্থ হইয়াছিল—জনগণের বাহুল্য আন্দোলনকে ব্যর্থতার হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে প্রবর্ত্তিত আইন-অমান্য আন্দোলনও বহুজনের সমর্থন লাভ সত্ত্বেও পরাস্ত হইয়া গিয়াছিল।

ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। নেপোলিয়ন যে বলিয়াছিলেন "Heaven is always on the side of the heaviest battalions"—সে কথা বাস্তব সমরের পক্ষেই প্রযোজ্য, রূপক লড়াইএ নহে। ভারতবর্ষে যে ধারায় রাজনৈতিক আন্দোলন হইয়াছে এবং হইতেছে,

তাহাতে persuasion ও moral pressure, আলোচনা ও নৈতিক প্রভাব—ইহাই একমাত্র অস্ত্র ও চরম sanction, বাহুবল নহে। সুতরাং এখানে পাণিপথের উপমা খাটে না। তাছাড়া, এই আলোচনা ও নৈতিক প্রভাব—ইহার মধ্যেও ঐক্যের কতকটা প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইতে পারে বটে; কিন্তু কখন? না, যখন শাসনতন্ত্র পুনর্গঠনের প্রস্তাব চলিতে থাকে, যখন অবস্থাটা অনিশ্চিত, পরিবর্ত্তনশীল বা fluid থাকে—যেমন বৎসর কয়েক পূর্ব্বে সাইমন কমিশন গোল-টেবিলের সময়ে ছিল, যেমন মণ্টেগু-সংস্কারের পূর্ব্বে লক্ষ্ণৌ প্যাক্টের সময়ে ছিল—কারণ তখন একটা ঐক্যমূলক দাবীতে শাসন-যন্ত্রের কতকটা সংস্কার সাধন করা সম্ভবপর। কিন্তু আজ যখন নূতন শাসন-সংস্কার বিধিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে, এবং তদনুসারে শাসনকার্য্য চলিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন আর নূতন করিয়া কি হইবে? যাহা হইবার তাহা ত হইয়া চুকিয়া গিয়াছে। রূপক সমরের আতঙ্কে ঐক্যের আবাহন এখন একেবারেই হাস্যাস্পদ।

প্রশ্ন উঠিতে পারে, সমর হউক বা না-ই হউক, জাতির বিভিন্ন অংশের মধ্যে ঐক্য থাকা ত বাঞ্ছনীয়। তবে ঐক্যের প্রচেষ্টায় দোষ কি? ইহার সহজ উত্তর এই—ঐক্যের প্রচেষ্টায় কোন দোষ আছে তাহা ত কেহ বলেনা, এবং ঐক্য যে বাঞ্ছনীয় তাহাও কেহ অস্বীকার করে না। কিন্তু ঐক্য লাভের জন্য যে কোন প্রচেষ্টাই যে নির্দ্দোষ তাহা বলা চলে না, এবং ঐক্য অপেক্ষা অধিক বাঞ্ছনীয় বস্তুও জাতীয় জীবনে নাই এমন নহে। উপায় ও উদ্দেশ্য যে গুলাইয়া ফেলা উচিত নহে তাহার ইঙ্গিত পূর্ব্বেই করিয়াছি; সেই কথাটা আর একটু বিশদ করা যাউক।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ভারতবর্ষে জাতীয় স্বাধীনতা বা আত্মকর্তৃত্ব লাভের জন্য যে উপায় অবলম্বিত হইয়াছে তাহা সশস্ত্র বিদ্রোহের উপায় নহে, সুতরাং যে হিসাবে সশস্ত্র যুদ্ধে ঐক্যের অত্যাবশ্যকতা, উপায়রূপে ঐক্যের

সে আবশ্যকতা আমাদের নাই। তবে উপায় হিসাবে ঐক্য খুব আবশ্যক না হইলেও উদ্দেশ্য হিসাবে ইহার বাঞ্ছনীয়তা থাকিতে পারে। এ কথা স্বীকার্য্য। কিন্তু এবিষয়ে প্রণিধানযোগ্য দুইটি কথা আছে।

ঐক্যকে যদি জাতীয় জীবনের অন্যতম উদ্দেশ্য বলিয়াই ধরা যায়, তাহা হইলেও মনে রাখিতে হইবে যে এতদপেক্ষা বড় উদ্দেশ্য ও মহত্তর আদর্শও জাতীয় জীবনে আছে। ঐক্য সমাধান করিতে গিয়া সেই উচ্চতর উদ্দেশ্য ও আদর্শকে বিসর্জ্জন দেওয়া চলে না। আন্তর্জ্জাতিক জীবনে যেমন শান্তির আদর্শ ; সকলেই স্বীকার করিবেন যে জাতি-সমূহের মধ্যে শান্তি থাকা বাঞ্ছনীয়, পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ ঘটা বাঞ্ছনীয় নহে ; কিন্তু যখন এমন অবস্থার উদ্ভব হয় যে আততায়ীর আক্রমণে স্বাধীনতা বিপন্ন, ন্যায়বুদ্ধি পদদলিত, মনুষ্যত্ব জর্জ্জরিত হইবার উপক্রম, তখন সেই সব মহত্তর আদর্শের রক্ষাকল্পে শান্তির পথই বর্জ্জনীয়, শক্তির মন্ত্রই অবলম্বনীয়—কারণ সেই যে শান্তি সে মরুর শান্তি, মৃত্যুর নিশ্চলতা, শ্মশানের স্তব্ধতা মাত্র ; জীবন্ত মানুষ, জীবন্ত জাতি সে শান্তিতে গজাইয়া উঠে না। বস্তুতঃ শান্তি একটা static concept মাত্র—তদপেক্ষা উচ্চতর দাবী ইহার কিছু নাই। যে পর্য্যন্ত জীবনের পরিপূর্ণ অভিব্যক্তির পক্ষে ইহা অনুকূল, সেই পর্য্যন্তই ইহা কাম্য ; যে মূহূর্ত্তে জাতির প্রাণ-স্পন্দনের ইহা পরিপন্থী হইয়া দাঁড়ায়, তখনই ইহা বিষবৎ পরিত্যাজ্য—তাই জাতীয় জীবনে placid pathetic contentment ভাঙ্গিয়া দিয়া জাগরণ আনয়ন করিতে হয়, তাই অসন্তোষকে অস্বস্তিকে divine discontent বলিয়া অভিনন্দিত করা হয়। আন্তর্জ্জাতিক জীবনে শান্তির যে স্থান, জাতির আভ্যন্তরিক জীবনে ঐক্যেরও সেই স্থান—বস্তুতঃ ঐক্য জাতির নানাবিভাগের মধ্যে শান্তি ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নহে। ঐক্যও তাই static concept মাত্র, এবং জাতীয় কল্যাণের পরিপন্থী হইলে সেই ঐক্য কাম্য নহে। যদি ঐক্য সংসাধন করিতে গিয়া জাতির কোন সম্প্রদায়ের প্রতি অন্যায় অবিচার করা

হয়, কোন অংশকে পঙ্গু করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করা হয়, ন্যায়ের আদর্শ, গণতন্ত্রের আদর্শ, স্বাধীনতার আদর্শ পদদলিত করা হয়, তবে সে ঐক্য এবং সে ঐক্য-প্রচেষ্টা অবাঞ্ছনীয়। জাতির ভবিষ্যৎকে, জাতির আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করিয়া আপাত দলবৃদ্ধির জন্য, ক্ষণিক সুবিধার জন্য, ঐক্য-সাধনের ব্যপদেশে দেশকে বলিদান করিবার অধিকার কোন রাষ্ট্রনেতার নাই। জাতীয় কল্যাণের দিকে অন্ধ হইয়া পরস্মৈপদী দান-খয়রাত করিয়া ঐক্যের প্রচেষ্টা ঔদার্য্যের পরিচায়ক নহে, অদূরদর্শিতারই নামান্তর মাত্র।

এইটিই বড় কথা। দ্বিতীয় আর একটি কথাও আছে। সে কথাটি এই। জাতীয় কল্যাণের পরিপন্থী যে ঐক্য-প্রচেষ্টা তাহা ত বর্জ্জনীয় বটেই; কিন্তু তেমন যদি না-ও হয়, যে ঐক্য একান্তই বাঞ্ছনীয়, এমন ঐক্য সাধন করিবারই বা উপায় কি? এ সম্বন্ধে সহজ কথাটা এই যে ঐক্য, ঐক্য, করিয়া চীৎকার করিলেই ঐক্য আকাশ হইতে নামিয়া আসে না—কতগুলি অবস্থার সমাবেশেই ঐক্য স্বভাবতঃই উদ্ভূত হয়, নচেৎ হয় না। যেমন, স্বাস্থ্য বা সুখ অন্বেষণ করিলেই পাওয়া যায় না, বরঞ্চ বেশী উৎকণ্ঠিত হইলে বেশী দূরে গিয়া পড়ে, কিন্তু দেহের ও মনের এক একটা অবস্থা আনয়ন করিতে পারিলে স্বাস্থ্য ও সুখ স্বতঃই উৎসারিত হয়। তত্তৎ অবস্থার উহারা যেন by-product। তদ্রূপ জাতীয় ঐক্যও জাতীয় জীবনের কতগুলি অবস্থার সমাবেশের by-product। সেই অবস্থা-নিচয়ের সমাবেশ যদি ঘটে তবেই ঐক্য স্বাভাবিক ভাবে গড়িয়া উঠে; নচেৎ ঐক্য হয় না; শত জোড়াতাড়া দিলেও ঐক্যের সন্ধান পাওয়া যায় না—অন্ততঃ স্থায়ী ঐক্যের পাওয়া যায় না। প্রবহমাণ জলের level যদি সমান করিতে হয় তবে তলদেশ horizontal করিলেই তাহা সম্ভব; নচেৎ, তলদেশ যদি ঢালু হয়, তবে বাঁধ দিয়া কিয়ৎক্ষণের জন্য জলের level সমান রাখা যায় বটে, কিন্তু জলের আভ্যন্তরিক চাপের প্রভাবেই সে বাঁধ টুটিয়া যায় এবং পুনরায় অসমান ভাবেই জলস্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে। ঐক্যের ব্যাপারেও অবিকল তাই। তলদেশ যদি

সমান থাকে, equality of opportunity থাকে, identity of interests থাকে, অর্থাৎ সমান সুযোগ ও অভিন্ন স্বার্থ থাকে, তবেই সমাজে ঐক্য-বন্ধন সম্ভব। ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের সময়ে যে তিনটি মহামন্ত্র উচ্চারিত হইয়াছিল—Liberty, Equality, Fraternity—তন্মধ্যে Fraternity-ই হইল ঐক্য, এবং এই তৃতীয় মন্ত্রের সাধন করিতে হইলে প্রথম মন্ত্রদ্বয়ে সিদ্ধিলাভ আবশ্যক। অবশ্য Liberty ও Equality, সাম্য ও স্বাধীনতা থাকিলেই যে ঐক্য বা মৈত্রী সাধিত হইবে তাহা বলা যায় না; কিন্তু উহাদের অভাবে যে মৈত্রীবন্ধন অসম্ভব তাহা স্বতঃসিদ্ধ।

আমাদের সমস্ত ঐক্য-প্রচেষ্টার মধ্যে এই কথাটি মনে রাখা দরকার। এই যে বিশাল ভারত-রাষ্ট্র, ইহার নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রহিয়াছে, নানা ভাগ-বিভাগ রহিয়াছে, নানা প্রদেশ নানা সম্প্রদায় রহিয়াছে। থাকা কিছুমাত্র অসঙ্গত নহে, পরন্তু অত্যন্ত স্বাভাবিক; কারণ, ভারতবর্ষ একটা রাষ্ট্র বটে—অন্ততঃ ইংরাজের আমলে—কিন্তু একটা জাতি নহে। যেমন ইউরোপে অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী একটা রাষ্ট্র ছিল শত শত বৎসর ধরিয়া, কিন্তু কোন দিনই একটা জাতি ছিলনা। তাই বিগত মহাযুদ্ধের পর যখন একমাত্র রাষ্ট্রবন্ধন—হাপ্‌স্‌বুর্গ-রাজের সাম্রাজ্য—খসিয়া গেল, অমনি সেই রাষ্ট্র শতধা বিচ্ছিন্ন হইয়া ভিন্ন ভিন্ন জাতিমূলক রাষ্ট্রে পরিণত হইল। ভারতবর্ষের অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ—ভারতের সমস্ত অতীত ইতিহাস তাহার সাক্ষী। সুতরাং ভারত-রাষ্ট্রের অভ্যন্তরস্থ এই বিভিন্নতা এই বৈষম্য কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে রেষারেষি, প্রদেশে প্রদেশে রেষারেষি, ইহা ত স্বাভাবিক। বরং স্বায়ত্তশাসনের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এই রেষারেষির বৃদ্ধি হওয়াই সম্ভব, কারণ struggle for power, প্রভুত্ব-প্রয়াস, সমস্ত জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যেই বদ্ধমূল; যখন ইংরাজই একচ্ছত্র অধিপতি ছিল এবং কি হিন্দু কি মুসলমান কাহারওই কোন ক্ষমতা ছিলনা, তখন ত রেষারেষির

অবকাশই ছিল না। কিন্তু শুধু কথায় ত চিঁড়া ভিজে না—শুধু নিখিল-ভারতীয় জাতীয়তার রূপকে এই বিরোধের সমাধান হয় না—এস্থলেও রূপক ও ভাষালঙ্কার একেবারেই শক্তিহীন।

সুতরাং যদি এই বিপুল ভারতবর্ষের মধ্যে, এই নানা প্রদেশে বিভক্ত নানা জাতি দ্বারা অধ্যুষিত নানা সম্প্রদায়-সমন্বিত মহাদেশে, একটা মৈত্রীবন্ধন প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়, তবে identity of interests প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। প্রাণের বন্ধন যখন নাই তখন স্বার্থের বন্ধনে বাঁধিতে হইবে। সুস্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে শিক্ষাক্ষেত্রে, ব্যবসায়ক্ষেত্রে, বাণিজ্য-ক্ষেত্রে, জীবনের প্রত্যেক বিভাগে, দৈনন্দিন কার্য্যকলাপে, পারিবারিক জীবনে, সামাজিক জীবনে, কি হিন্দু কি মুসলমান কি পার্সী কি শিখ, কি বাঙ্গালী কি বিহারী কি পাঞ্জাবী কি মান্দ্রাজী, সকলেরই স্বার্থ এক এবং পরস্পরের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। শুধু কথায় বলিলে চলিবে না, শুধু রূপকে প্রচার করিলে চলিবে না, কাহারও প্রতি পক্ষপাত না করিয়া কাহারও প্রতি অবিচার না করিয়া সকল সম্প্রদায়ভুক্ত সকল প্রদেশভুক্ত ব্যক্তিগণকে সমান ক্ষমতা দিতে হইবে, সমান সুযোগ দিতে হইবে। যদি কোন সম্প্রদায় অনুন্নত পশ্চাৎপদ থাকিয়া থাকে, কি হিন্দু কি মুসলমান, তাহাদের জন্য বিশেষ শিক্ষা-দীক্ষার আয়োজন করিয়া উন্নত করিয়া লইতে হইবে—উন্নতকে অবনত করিয়া সাম্য আনয়ন করা জাতীয় কল্যাণের পথ নহে। সকল সম্প্রদায়কে শক্তিমান্ করিয়া তুলিতে হইবে, কারণ দুর্ব্বলে সবলে যথার্থ ঐক্য হয় না। নেপোলিয়নের উদাত্ত বাণী—*La carrière ouverte aux talents*—প্রতিভার পথ উন্মুক্ত হউক—সেই বাণী জাতীয় সমাজ-ব্যবস্থার মূলমন্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। সাম্য ও স্বাধীনতার উপরে ভারতীয় রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ও সমাজ-ব্যবস্থা গঠিত হইলে জাতীয় জীবনে মৈত্রী স্বতঃস্ফূর্ত্ত হইয়া উঠিবে।

এই সব ব্যবস্থা রূপকের বিলাস নহে, অথবা চুক্তি এবং দর-কষাকষির বাজারে' ব্যাপারও নহে। সাম্যের পথ, ন্যায়ের পথ, সুবিচারের পথ—জাতীয়

ঐক্য সাধনের ইহাই একমাত্র পথ। ইহা পরিহার করিয়া যদি আমাদের নেতৃগণ কেবল রূপকের পথ ও দরাদরির পথেই চলিতে থাকেন, তবে যাহা লাভ হইবে তাহা ঐক্য নহে, নানা জাতি নানা সম্প্রদায়ের ঈর্ষ্যাদ্বেষের বিষ-বাষ্পোত্থিত ঐক্যের আলেয়া মাত্র। সেই আলেয়ার সন্ধানে ঘুরিতে ঘুরিতে কোন্ মৃত্যুস্তর পঙ্কে যে ভারতের জনগণ নিমজ্জিত হইবে তাহা কে বলিতে পারে ?)

চৈত্র, ১৩৪৪।

হাবসী-সঙ্কট

হাব্‌সী-সঙ্কট

আজকাল খবরের কাগজের কলম আবিসিনিয়ার সংবাদে ভরপূর। এই আবিসিনিয়াই হাব্‌সীদের দেশ। হাব্‌সী নামটি আমাদের দেশে খুবই পরিচিত। ভারতবর্ষের ইতিহাসে মুসলমান প্রাধান্যের আরম্ভের পর হইতে বহুস্থলেই হাব্‌সী খোজা কিংবা ক্রীতদাস কিংবা সেনাপতির উল্লেখ দেখা যায়। আমাদের বাঙ্গালাদেশের বিচিত্র ইতিবৃত্তেও হাব্‌সী-প্রাধান্য যে কোন কোন সময়ে লক্ষিত না হইয়াছে এমন নয়। শ্রীচৈতন্যের সময়ে যিনি গৌড়েশ্বর বা বাঙ্গালার অধিপতি ছিলেন, সুলতান হুসেন শাহ, তাঁহারই অব্যবহিত পূর্ব্বে এক হাব্‌সী সেনাপতি তদানীন্তন বঙ্গীয় সুলতানকে নিহত করিয়া বাঙ্গালার মস্‌নদ দখল করিয়া কিয়দ্দিন রাজত্ব করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ মধ্যযুগে আবিসিনিয়াবাসী হাব্‌সীদিগের সহিত প্রাচ্য ভূখণ্ডের খুবই ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল।

এই হাব্‌সী কাহারা? ইহারা আসলে জাতিতে সেমিটিক বা আরব। বস্তুতঃ লোহিত সাগরের উভয় তীরে যে সব জাতি বাস করে তাহারা মূলতঃ একই জাতীয় অর্থাৎ সেমিটিক। বহু প্রাচীনকাল হইতে এই সেমিটিক সভ্যতার উদ্ভব; এবং আবিসিনিয়ার ইতিহাসও অতি প্রাচীন। বর্ত্তমান যে রাজবংশ তাঁহারা বাইবেল-প্রসিদ্ধ রাজা সলোমনকে বংশের আদি পুরুষ বলিয়া দাবী করেন। তাঁহাদের বিশ্বাস এই যে বিখ্যাত রাজ্ঞী সেবার গর্ভে রাজা সলোমনের যে পুত্র সন্তান হইয়াছিল তাঁহার নাম মেনেলেক, এবং সেই মেনেলেকই বর্ত্তমান হাব্‌সী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। এই আবিসিনিয়ার প্রাচীন নাম ছিল ইথিওপিয়া; হাব্‌সীগণ এখনও নিজেদের দেশকে ঐ নামেই অভিহিত করিয়া থাকে। হাব্‌সী নামটি প্রদত্ত হইয়াছে এসিয়াবাসী আরবগণের দ্বারা। হাব্‌সী শব্দের অর্থ মিশ্র বা মিশান। আরববংশীয় ছাড়াও খোদ আফ্রিকার অনেক জাতি এবং ইহুদী ইত্যাদি জাতি ঐ দেশে গিয়া বসবাস করাতে এখন উহা বহুবিধ জাতির বাসভূমি, তাই আরবগণ উহাদিগকে "হাব্‌সী" আখ্যা দিয়াছে; এবং এই "হাব্‌সী" কথা হইতেই "আবিসিনিয়া" নামটির উদ্ভব।

সে যাহাই হউক, ইহা একটা কম বিস্ময়ের কথা নহে যে, খৃষ্ট-পূর্ব্ব সহস্রাধিক বৎসর হইতে আজ পর্য্যন্ত মোটামুটি ভাবে একটা অক্ষুণ্ণ সভ্যতার ধারা এবং একটা অবিচ্ছিন্ন ঐতিহাসিক পারম্পর্য্য এই দেশ এবং জাতির ভিতরে অব্যাহত ভাবে চলিয়া আসিতেছে। ইহার উপর দিয়া অনেক ঝঞ্ঝা বহিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহাতেও ইহার ধারাবাহিকতা নিশ্চিহ্ন ভাবে মুছিয়া দিতে পারে নাই। বাইবেলে বিদ্রূপচ্ছলে বর্ণিত আছে, "The Ethiopian cannot change his skin, nor the leopard his spots"—কিন্তু এই ইথিওপিয়গণ কেবল যে বর্ণ-সাদৃশ্য রক্ষা করিয়া আসিয়াছে তাহা নহে, আশ্রমধর্ম্মও রক্ষা করিয়াছে, এবং সংস্কৃতির ধারা মোটামুটি বজায় রাখিয়াছে। ঐতিহাসিক অনেক বিপ্লব ইহার ভাগ্যে হইয়াছে—কোন সময়ে ইহা মিশরের

অধীনস্থ ছিল, আবার যখন সমগ্র মিশর পারস্য-সম্রাট্ ক্যাম্বিসিসের অধীনে আসিল তখন হাব্সী রাজ্যও সেই বিপুল বিশাল পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেল। তারপর এমন দিনও গিয়াছে যখন হাব্সী সম্রাট শুধু নিজের দেশেই স্বাধীন ভাবে রাজ্য পরিচালনা করিতেন এমন নহে, সুদূর আরবদেশের বহুস্থানও তিনি শাসন করিতেন। রোমক কৈশর কন্ষ্টানটাইন্ যখন খৃষ্টীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া সমগ্র রোমক সাম্রাজ্যে খৃষ্টধর্ম্মকে রাষ্ট্রধর্ম্ম ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, প্রায় সেই সময়েই অর্থাৎ খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে হাব্সীগণও খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিল। সুতরাং হাব্সী রাজবংশ খৃষ্টান এবং রাজ্যেও বহুলোক খৃষ্টান। কিন্তু এই খৃষ্টধর্ম্ম বর্ত্তমান ইউরোপের মিশনারী দ্বারা প্রচারিত খৃষ্টধর্ম্ম নহে; এমন কি যখন ইউরোপীয় ধর্ম্ম-সমাজে পোপের পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠা হয় নাই, তখন হইতেই হাব্সীগণ খৃষ্টান। ইহারা প্রোটেষ্টাণ্টও নহে, রোমান ক্যাথলিকও নহে। তারপরে যখন ইস্লাম ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন হইল, তখন অনেক মুসলমান স্বজাতির অত্যাচারে স্বদেশে অতিষ্ঠ হইয়া আবিসিনিয়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে, এবং হাব্সী সম্রাট্ সাদরে তাহাদিগকে আশ্রয় দান করেন। ইহার পর হইতে এই দেশে মুসলমান সম্প্রদায়ও খুব বাড়িয়া গিয়াছে। সুতরাং এখন আবিসিনিয়গণ বাস্তবিকই হাব্সী বা মিশ্রজাতি। এই বিপ্লব-বিশৃঙ্খলার মধ্য দিয়াও মোটামুটি ভাবে যে রকম প্রাচীন ঐতিহ্য ও সভ্যতার ধারাবাহিকতা আবিসিনিয়া রক্ষা করিয়াছে তাহার তুলনা বোধ হয় মহাচীন ও ভারতবর্ষ ব্যতীত আর কোথাও পাওয়া যায় না।

বর্ত্তমান যুগে যখন উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে ইউরোপীয়গণ ধীরে ধীরে আফ্রিকা মহাদেশটি দখল করিতে আরম্ভ করিলেন, তখনও আবিসিনিয়া দেশে বড় সহসা কেহ দন্তস্ফুট করিতে পারিলেন না। কারণ ইহা প্রকৃতি-কর্ত্তৃক অতি সুদৃঢ়ভাবে সংরক্ষিত। আবিসিনিয়া দেশটি একটি প্রকাণ্ড অধিত্যকা; এই অধিত্যকার আয়তন প্রায় দুইটা ইটালীর সমান;

ইহার উচ্চতা গড়ে সমুদ্র হইতে প্রায় ৮০০০ ফুট অর্থাৎ দার্জ্জিলিংএর অপেক্ষাও বেশী; এবং এই অধিত্যকাটি সমুদ্রের উপকূলবর্ত্তী সমতল দেশ হইতে একেবারে প্রায় খাড়া দেয়ালের মত উঠিয়াছে; সুতরাং সমতল দেশ হইতে এই অধিত্যকায় আরোহণ করাই অতি দুরূহ ব্যাপার। এবং একবার উঠিতে পারিলেও, নদী নালা বন জঙ্গল পাহাড় পর্ব্বতে অধিত্যকা-ভূমিও এত সমাকীর্ণ যে তথায় যুদ্ধবিগ্রহ করা এক ভীষণ সমস্যা। বস্তুতঃ মধ্য-এসিয়ার তিব্বত-অধিত্যকা ব্যতীত এত উচ্চ ও এত বৃহৎ অধিত্যকা পৃথিবীতে আর আছে কি না সন্দেহ। এই দুর্গমতার দরুণই ইউরোপীয়দিগের প্রবল সাম্রাজ্য-লিপ্সা সত্ত্বেও সহজে আবিসিনিয়ার অভ্যন্তরে কেহ প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই। তবে ইহার উপরে লোলুপ দৃষ্টি অনেকেরই ছিল, কারণ এত উচ্চতা সত্ত্বেও ইহার ভূমি খুবই উর্ব্বরা, কাজেই প্রকৃতি বিপুল শস্য-সমৃদ্ধি-শালিনী—তাছাড়া বিবিধ খনিজ পদার্থে আবিসিনিয়ার ভূগর্ভ পরিপূর্ণ।

যাহা হউক, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, প্রভৃতি অন্যান্য ইউরোপীয় জাতির দেখা দেখি ইটালীরও অভিলাষ হইল আফ্রিকায় অন্ততঃ কোথাও একটু আস্তানা যোগাড় করিতে। তাই কিঞ্চিদধিক ষাট বৎসর হইল, ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে একটি ইটালীয় কোম্পানী গঠিত হইল লোহিত সাগরে বাণিজ্য করিবার উদ্দেশ্যে। সেই কোম্পানী লোহিত সাগরের পশ্চিম উপকূলে আসাব নামক একটি বন্দরের খানিকটা জায়গা ইজারা লইল। ঠিক যেন ইংরাজের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সুতানুটি-গোবিন্দপুর-কলিকাতা গ্রাম ইজারা লওয়ার ন্যায়। পরবর্ত্তী ইতিহাসও কতকটা উহারই অনুরূপ। কোম্পানী তাহাদের ব্যবসায়ে বড় সুবিধা করিতে পারিল না; তাই স্বয়ং ইটালীয় গভর্ণমেণ্ট কোম্পানীর কাজ নিজের হাতে গ্রহণ করিলেন এবং ধীরে ধীরে খানিক খানিক করিয়া জায়গা দখল করিতে লাগিলেন। অবশ্য এই সমস্ত জায়গাই সমতল দেশে, আসল অধিত্যকার উপরে ইটালীয়গণ তেমন কিছু করিতে

পারিল না। আবিসিনিয়ার সহিত ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জের, বিশেষতঃ ইটালীর ব্যবহারের ইতিহাসে নানা অধ্যায় হইয়া গিয়াছে। কখনও নরম কখনও গরম, কখনও সন্ধি কখনও বিরোধ। মোট কথা, যে প্রণালীতে ভারতবর্ষে

"বণিকের মানদণ্ড পোহালে শর্ব্বরী
দেখা দিল রাজদণ্ড রূপে",

সেই প্রণালীই ইটালী আবিসিনিয়ায় অনুসরণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছে।

বাণিজ্য ব্যপদেশে ইটালী আবিসিনিয়ার সন্নিহিত ভূখণ্ডে—যাহাকে এখন এরিট্রিয়া এবং ইটালীয় সোমালীল্যাণ্ড বলে—তথায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া আবিসিনিয়ার অভ্যন্তরে শক্তিশালী হইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। তখন দ্বিতীয় মেনেলেক হাবসী সম্রাট্; তিনি খুব উন্নতিশীল ও ক্ষমতাশালী নৃপতি ছিলেন। তাঁহার আমলে প্রথম প্রথম ইটালী খুবই মিতালী করিতে লাগিল এবং তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিল যে ইটালী আবিসিনিয়ার পরম বন্ধু, এবং সমস্ত বৈদেশিক ব্যাপারে ইটালী যদি আবিসিনিয়ার পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করে তবে আবিসিনিয়ারই সুবিধা। এই সমস্ত প্রলোভন ও প্ররোচনার ফলে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে রীতিমত সন্ধি-পত্র হইল—তাহাকে বলে উচ্চাল্লীর সন্ধি (Treaty of Uccialli)। কয়েক বৎসর ভাল ভাবেই কাটিল। কিন্তু আবিসিনিয়াকে ভালমানুষ পাইয়া ইটালী ক্রমশঃই বেশী বাড়াবাড়ি করিতে লাগিল; বলিতে লাগিল যে, বৈদেশিক ব্যাপারে আবিসিনিয়ার কোনই স্বাতন্ত্র্য থাকিবে না, একেবারে ইটালীর তাঁবে থাকিতে হইবে; এমন কি কার্য্যতঃ আবিসিনিয়াকে ইটালীর একটি প্রদেশে পরিণত করিতে উদ্যত হইল। সম্রাট্ মেনেলেক দেখিলেন যে এই আস্পর্দ্ধা অসহ্য; তিনি ঘোষণা করিলেন যে উচ্চাল্লীর সন্ধি আর অতঃপর মানা হইবে না। ইটালী ত চটিয়াই লাল; কালা আদ্মীর দেশের লোক শ্বেতাঙ্গের সহিত এইরূপ বেয়াদবী করিতেছে! অবিলম্বে সমর-সজ্জা হইল। কিন্তু এই যুদ্ধোদ্যমের

ফল হইল অপ্রত্যাশিত; ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত আডোয়ার যুদ্ধে ইটালীর সৈন্য শোচনীয় ভাবে পরাজিত হইল—বহু সহস্র সৈন্য আবিসিনিয়ার হস্তে বন্দী হইল। সমস্ত ইউরোপ এই অভাবনীয় ব্যাপারে চমকিত হইল। সম্রাট্ মেনেলেকের নাম গৃহে গৃহে উচ্চারিত হইতে লাগিল। বর্ত্তমান যুগে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংঘর্ষে প্রাচ্যের জয় এই প্রথম। তারপর অবশ্য রুশ-জাপান যুদ্ধ, গ্রীক-তুরস্ক যুদ্ধ ইত্যাদি যুদ্ধে প্রাচ্যের জয় হওয়ায় পাশ্চাত্যের দম্ভ অনেকটা নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রাচ্য জাগরণের প্রথম নিদর্শন হিসাবে আডোয়ার যুদ্ধ চিরস্মরণীয় হইবার যোগ্য।

ইহার অব্যবহিত পরের ইতিহাস সংক্ষেপেই বলা যাইতে পারে। সম্রাট্ মেনেলেক কর্ত্তৃক ইটালীর পরাজয়ের পর হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল ইউরোপীয় জাতিদিগের মধ্যে, কে আগে গিয়া আবিসিনিয়ার সঙ্গে মিতালী করিতে পারে, তথায় বাণিজ্য ব্যবসায়াদির সুবিধা করিয়া লইতে পারে। কয়েক বৎসর পরে, ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে, ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও ইটালী এই তিন জাতি একযোগে আবিসিনিয়ার সঙ্গে সীমানা-বিষয়ক এবং আরও আভ্যন্তরিক অনেক বিষয়-সংক্রান্ত একটা চুক্তি করিলেন; সেই চুক্তিই আজ পর্য্যন্ত বলবৎ রহিয়াছে। বহুদিন সসম্মানে সগৌরবে রাজত্ব করিয়া সম্রাট্ মেনেলেক ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ইহলীলা সংবরণ করিলেন। তারপর কিছুদিন অন্তর্বিপ্লব চলিবার পর ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে সম্রাটের কন্যা জাউদিতু রাজ্ঞী বলিয়া ঘোষিত হইলেন, এবং সম্রাটের ভাইপো-সম্পর্কিত রাস্ টাফারি Regent বা প্রতিনিধি পদে অভিষিক্ত হইলেন। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে রাজ্ঞী মারা গেলেন এবং তৎপরে রাস্ টাফারি সম্রাট্ হইলেন; ইনিই বর্ত্তমানে হাবসী সম্রাট্। ইনি দেশের ভিতর অন্তর্বিপ্লব দমন করিয়াছেন; দেশে কৃতী যুবকদিগকে বিদেশে পাঠাইয়া আধুনিক বিদ্যায় শিক্ষিত করিয়াছেন; নিজে ইউরোপে ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন এবং বেশ উন্নতিশীল ও বিচক্ষণ নৃপতি বলিয়া ইনি পরিচিত। কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অন্যান্য জাতিদিগের ন্যায় ইটালীর

সহিতও ইঁহার বেশ সৌহার্দ্দ্য ছিল। এমন কি ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে জাতিসঙ্ঘের সভ্যরূপে আবিসিনিয়াকে মনোনীত করিবার প্রস্তাব ইটালীই তুলিয়াছিল; এবং ১৯৩০ খৃষ্টাব্দেও ইটালী আবিসিনিয়ার সহিত perpetual friendship বা চিরন্তন মৈত্রীমূলক এক সন্ধি স্থাপন করিয়াছিল।

হঠাৎ চারি পাঁচ বৎসরের মধ্যেই "চিরন্তন" মৈত্রী একেবারে টুটিয়া গেল এবং রোমের রণডঙ্কা বাজিয়া উঠিল, ইহার মধ্যে আসল ব্যাপারটা কি? ইহা বুঝিতে হইলে বিগত কয়েক বৎসরের ইউরোপীয় জাতিদিগের অবস্থা একটু তলাইয়া বুঝা দরকার; এবং এই যে ভিতরের কথা—ইহাই এই হাব্‌সী-সঙ্কটকে একটা বিশ্বসঙ্কট বা world-crisis-এ পরিণত করিয়াছে।

প্রধান কথাই হইল ইটালীর সর্ব্বময় কর্ত্তা মুসোলিনির প্রভুত্বলিপ্সা এবং জিগীষা। মুসোলিনি কাল-কোর্ত্তার দল গঠন করিয়া ১৯২২ খৃষ্টাব্দে পার্লামেণ্টারী বা নিয়মতন্ত্র শাসন-প্রণালী বিধ্বস্ত করিয়া ইটালীতে ফাশিষ্ট শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে ও ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে মুসোলিনি যে আবিসিনিয়ার প্রতি সদয় ভাব ও সহানুভূতি দেখাইয়াছিলেন, তাহার প্রধান কারণ এই যে নিজের দেশের মধ্যেই তাহার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে ততদিন তাঁহাকে সচেষ্ট হইতে হইয়াছিল, বৈদেশিক অভিযান আরম্ভ করা তিনি তখন যুক্তিযুক্ত মনে করেন নাই। ইটালীর সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করিতেই তিনি তখন যত্নপর ছিলেন। কারণ মুসোলিনির মনের প্রকৃত যে অভিলাষ—যাহা মাঝে মাঝে বক্তৃতায় তিনি বলিয়া ফেলেন—অর্থাৎ ভূমধ্যসাগরে ইটালীর প্রভুত্ব স্থাপন করা এবং যথাসম্ভব প্রাচীন রোমক-সাম্রাজ্যের গৌরব ও মহিমা পুনরুদ্ধার করা, তাহা চরিতার্থ করিতে গেলে ত শুধু কথায় চিঁড়া ভিজিবে না, প্রভূত সৈন্যসম্ভার চাই; কারণ শেষ পর্য্যন্ত এই বিজয়-অভিযানে অর্দ্ধ-পৃথিবীর অধীশ্বরী ইংলণ্ডের সহিত সংঘাত অনিবার্য্য। মুখে অবশ্য এই সমস্ত গোপন সম্ভাবনা কেহই বড় একটা প্রকাশ করে না।

আজ মুসোলিনির ধারণা যে শক্তি-পরীক্ষার সামর্থ্য তাঁহার হইয়াছে; তাই আবিসিনিয়ার সীমান্ত প্রদেশে উয়াল-উয়াল নামক স্থানে গত ডিসেম্বর মাসে সামান্য সংঘর্ষ উপলক্ষ্য করিয়া আজ তিনি একেবারে বিজয় অভিযানে অবতীর্ণ হইতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। আবিসিনিয়ার সমস্যার ভিতরের কথা ইহাই।

প্রথমতঃ মনে হইতে পারে যে সাগর-বক্ষের অদ্বিতীয় সম্রাজ্ঞী—Mistress of the seas—যে ইংলণ্ড, তাহার সহিত শক্তি-পরীক্ষার কল্পনা করাও সামান্য ইটালীর পক্ষে বাতুলতা মাত্র। কিন্তু একটা কথা বীরকেশরী নেপোলিয়ন বলিয়া গিয়াছিলেন, "Even in war the moral is to the physical as ten is to one"—যুদ্ধ-ব্যাপারেও গায়ের জোর অপেক্ষা মনের জোর দশ গুণ কাজ করে। বিগত মহাযুদ্ধের পর হইতে ইংলণ্ডের রাজনীতিজ্ঞগণ যেরূপ ভাবে নিজেদের সাম্রাজ্যরক্ষা ও শক্তি-সংরক্ষণ বিষয়ে উদাসীন হইয়াছেন এবং কতকটা pacifism, কতকটা sentimentalism, কতকটা খরচ কমাইবার প্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া যে ভাবে স্বদেশকে পঙ্গু করিতেছেন, তাহাতে এমন যে আপাততঃ বাতুল কল্পনা তাহাও আর তেমন বাতুল বলিয়া মনে হয় না। দুই একটা উদাহরণ দেওয়া যাউক।

ইংলণ্ডের সৈন্যবল কিছুই নহে, অতি অকিঞ্চিৎকর। মহাযুদ্ধের সময়ে যে ৫০।৬০ লক্ষ সৈন্য তোলা হইয়াছিল, তাহা ত যুদ্ধাবসানের সঙ্গে সঙ্গেই ছাড়াইয়া দেওয়া হয়; ইংলণ্ডের সৈন্য-বাহিনী এখন আবার সেই সাবেক মুষ্টিমেয় লাখ দুই-এর Standing Army-তে পর্য্যবসিত হইয়াছে। (এত বড় বিস্তৃত সাম্রাজ্যের সম্পূর্ণ নির্ভর নৌ-শক্তির উপর। এখন অবশ্য Air-Power একটা নূতন জিনিষ দাঁড়াইয়াছে—তাহাতে ইংলণ্ড ত গ্রাহ্যের মধ্যেই আসে না, কারণ শ্রেষ্ঠ শক্তি-পুঞ্জের মধ্যে এ বিষয়ে ইংলণ্ডের আসন বোধ করি পঞ্চম কিংবা ষষ্ঠ স্থানে। এই ত সেদিন মাত্র দেশময় অনেক চেঁচামেচি হইবার পর তাড়াতাড়ি কতগুলি এয়ারোপ্লেন বানাইবার এক প্রস্তাব করিতে ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী বলডুইন সাহেব বাধ্য হইয়াছেন।)

রহিল সেই নৌ-শক্তি। মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে ইংলণ্ডের নৌ-শক্তির পরিমাণ ছিল two-power standard—অর্থাৎ ইংলণ্ডের নৌ-বহর যে কোন দুইটি সম্মিলিত নৌ-বহরের সমান অথবা বেশী থাকিবে। সাম্রাজ্য রক্ষার দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে ইহাই যুক্তিযুক্ত পরিমাণ; কারণ ইংলণ্ডের নৌ-শক্তি প্রধানতঃ তিনস্থানে রাখিতে হয়, Home waters (অথবা North Sea), ভূমধ্য সাগর এবং প্রশান্ত মহাসাগর। প্রশান্ত মহাসাগরে প্রবল শক্তিশালী দুর্দ্ধর্ষ জাপান রহিয়াছে। ভূমধ্য সাগরে জিব্রাল্টার, মল্টা, পোর্ট সৈয়দ ও সুয়েজ ইংরাজদিগের হস্তে, এবং প্রাচ্য সাম্রাজ্যে যাতায়াতের পথই ভূমধ্য সাগরের মধ্য দিয়া; সুতরাং ভূমধ্য সাগরে ও লোহিত সাগরে নৌ-শক্তির প্রাধান্য ইংলণ্ডের হাতে না থাকিলে তিন দিনও তাহাদের সাম্রাজ্য রক্ষা হইতে পারে না। ইহা বুঝিয়াই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের যাঁহারা গোড়া পত্তন করিয়াছিলেন সেই সমস্ত সুচতুর ও দূরদর্শী রাষ্ট্রনীতিজ্ঞগণ ঐ সব ঘাঁটি অত্যন্ত শক্তভাবে আট্‌কাইয়াছিলেন। আর Home waters-এর ত আলোচনাই নিষ্প্রয়োজন, জার্ম্মেণী ও ফ্রান্স এই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিদ্বয়কে ত সামলাইতে হইবেই। Two-power standard-এর গোড়ার কথা ইহাই।

এখন দেখা যাউক, মহাযুদ্ধের পর বলডুইন-ম্যাক্‌ডোনাল্ড কোম্পানীর হাতে পড়িয়া ব্রিটিশ নৌ-শক্তির অবস্থা কি দাঁড়াইয়াছে। প্রথমতঃ প্রশান্ত মহাসাগরের কথাই ধরা যাউক। প্রশান্ত মহাসাগরস্থ ব্রিটিশ নৌ-বাহিনীর একটি সুদৃঢ় আড্ডা থাকা দরকার, ইহা বিবেচনা করিয়া স্থির হইল যে সিঙ্গাপুরে একটা খুব বড় রকম Naval Base করিতে হইবে, তবেই ঐ অঞ্চলে জাপানের সঙ্গে কতকটা সমকক্ষতা করা সম্ভব। স্থির হইবার পর কাজকর্ম্ম আরম্ভ হইল। তখন বল্‌ডুইন প্রধান মন্ত্রী। কিছুদিন পরে শ্রমিক গভর্ণমেণ্ট হইল, ম্যাক্‌ডোনাল্ড সাহেব প্রধান মন্ত্রী হইলেন; সেই প্রথম বার Labour Government—একেবারে pacifism-এ ভরপুর। ঠিক হইল, না, Singapore Base করা উচিত নহে, বন্ধ

করিয়া দেও—তার চেয়ে ঘরে বসিয়া বেকারদিগকে dole অথবা মাসহারা দিলে ঢের বেশী কাজ হইবে। রহিল Singapore Base মুলতুবী। আবার কিছুদিন পরে বল্‌ড্‌ুইন মন্ত্রী হইলেন, আবার কাজ আরম্ভ হইল; আবার শ্রমিক শাসনের আগমনে আবার বন্ধ হইল। ইহাই সিঙ্গাপুর ঘাঁটির প্রহসন। ওদিকে জাপান ত দিনের পর দিন তাহার নৌ-বাহিনী বাড়াইয়াই চলিয়াছে; সে জাতি-সংঘ পরিত্যাগ করিয়াছে; মাঞ্চুরিয়াকে পূর্ণগ্রাস করিয়াছে; চীনকেও অৰ্দ্ধগ্রাস করিবার উপক্রম; প্রশান্ত মহাসাগরস্থ অনেক দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করিয়া Naval Base করিতেছে।

ইংলণ্ডের বর্ত্তমান নেতাদিগের দ্বিতীয় কীৰ্ত্তি ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের Washington Naval Conference; তাহাতে স্থির হইল ইংলণ্ডের two-power standard আর থাকিবে না, ইংলণ্ড আমেরিকা ও জাপানের নৌ-বাহিনীর অনুপাত হইবে ৫:৫:৩। অর্থাৎ আমেরিকা হইবে ইংলণ্ডের সমান—যদিও আমেরিকার কোন সুদূরপ্রসারী সাম্রাজ্য নাই (ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ ত উল্লেখ যোগ্যই নহে), দুই ধারে দুই মহাসাগর, মধ্যে বিরাট্‌ স্থলভাগ, সুতরাং বিপুল নৌ-শক্তির কোন আবশ্যকতাই তাহার নাই; আর জাপানের হইবে ইহাদের তুলনায় তিন-পঞ্চমাংশ। আজকাল জাপান বলিতেছে যে সে ঐ অনুপাতে আর সন্তুষ্ট নহে, সেও ইংলণ্ড ও আমেরিকার সমান নৌ-বাহিনী রাখিবার অধিকারী। ওয়াশিংটনের এই বন্দোবস্তের ফলে বিগত দশ বৎসরে ইংলণ্ড অতি অল্পসংখ্যক রণতরী প্রস্তুত করিয়াছে, এবং তাহার যাহা আছে তাহারও অধিকাংশই মহাযুদ্ধের সময়কার, অনেকটা obsolete; আর আমেরিকা নূতন নূতন রণতরী তৈয়ার করিয়া ইংলণ্ডের সমকক্ষ এবং কোন কোন স্থানে অধিক শক্তিশালী হইয়াছে; জাপানও প্রায় তাই।

আর বল্‌ড্‌ুইন-ম্যাক্‌ডোনাল্ডের তৃতীয় কীৰ্ত্তি হইল এই সেদিনকার জার্ম্মেণীর সঙ্গে নৌ-চুক্তি—যাহাতে স্থির হইয়াছে যে ইংলণ্ডের সমগ্র নৌ-বাহিনীর শতকরা ৩৫ পরিমাণ অর্থাৎ ৩৫% নৌ-বাহিনী জার্ম্মেণী তৈয়ার

করিতে পারিবে। তাহার ফল দাঁড়াইল এই যে, ইংলণ্ডের Home Waters-এর যে নৌ-বাহিনী, যাহা কার্য্যতঃ সমগ্র নৌ-বাহিনীর এক-তৃতীয়াংশ আন্দাজ, তদপেক্ষা জার্ম্মাণ নৌ-বাহিনী বলবত্তর হইবে। ইংলণ্ডকে নৌ-শক্তি বিষয়ে এই অবস্থায় তাহার বর্ত্তমান নেতারা দাঁড় করাইয়াছেন।

এখন মুসোলিনির কথায় আসা যাউক। ওয়াশিংটন কন্‌ফারেন্সে প্রধান নৌ-শক্তির মধ্যে ফ্রান্স ও ইটালী পরিগণিত হয় নাই। তাহারা দ্বিতীয় শ্রেণীতে গিয়া পড়িয়াছে। তবে তাহার মধ্যেও আবার ফ্রান্স অপেক্ষা ইটালীকে একটু নিম্নস্থান দেওয়া হইয়াছে। এই তারতম্য লইয়া বহুবৎসর ইটালী ও ফ্রান্সে মন কষাকষি হইয়া গিয়াছে; ইটালী বলিয়াছে যে ফ্রান্সের সমান তাহার নৌ-শক্তি চাই, এবং অনেক ধ্বস্তাধ্বস্তির পর মুসোলিনির দাপটে ফ্রান্সকে এই parity অথবা তুল্যতা স্বীকার করিতে হইয়াছে। ফ্রান্স যে অবশেষে ইটালীর সঙ্গে ঐ বিষয়ে রফা করিল, তাহার আর একটি প্রধান কারণ জার্ম্মেণীর পুনরভ্যুদয়। জার্ম্মেণীর ভয়েই ফ্রান্স অস্থির, সুতরাং এ অবস্থায় ইটালীর সঙ্গে আর কোন প্রকার মনোমালিন্য রাখা সমীচীন নহে; তাই নৌ-সন্ধি হইয়া গেল। তাই এই আবিসিনিয়ার গণ্ডগোলেও মনে মনে ইটালীর কার্য্যকে যতই অপ্রীতিকর বলিয়া ফ্রান্স মনে করুক না কেন, কোন ক্রমেই ফ্রান্স ইটালীর বিরুদ্ধে অঙ্গুষ্ঠমাত্র উত্তোলন করিবে না। এ কথা ত ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রী মঁসিয়ে লাভাল স্পষ্টই ইটালীকে বলিয়া দিয়াছেন।

সুতরাং মুসোলিনির ভূমধ্য সাগরে প্রতিষ্ঠালাভের একমাত্র অন্তরায় রহিল ইংলণ্ড; এবং ইংলণ্ডের নৌ-শক্তি অপেক্ষাকৃত ক্ষীণবল, তদুপরি ত্রিধা-বিভক্ত। কতখানি নৌ-বাহিনী ইংলণ্ড উত্তর সাগর এবং প্রশান্ত মহাসাগর হইতে সরাইয়া ভূমধ্য সাগরে আনিয়া ফেলিতে ভরসা করিবে? বিখ্যাত ইংরাজ সম্পাদক মিঃ গার্ভিন ত স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন:

"For the moment the Italians have us on the hip. From Gibraltar to Aden we could not to-day by our own efforts hold the route to India and the life-line of Empire against a hostile Italy".

আর সর্ব্বোপরি মুসোলিনির ভরসা সেই pacifism, বণিক্-সুলভ ব্যয়-সঙ্কোচ-প্রিয়তা এবং মেরুদণ্ডহীনতা ও কাপুরুষতা যাহা ইংলণ্ডের শক্তিকে ম্লান করিয়া ফেলিয়াছে।

আবিসিনিয়া-সমস্যার অন্তরালে এত বহু ব্যাপার রহিয়াছে বলিয়াই ইংলণ্ডে আজ এত চাঞ্চল্য। অবশ্য যেরূপ নগ্ন বর্ব্বরতার সহিত মুসোলিনি আবিসিনিয়ার সহিত ব্যবহার করিতেছে এবং সমস্ত জগৎকে ও বিশেষতঃ ইংলণ্ডকে নস্যাৎ করিয়া দিতেছে, তাহাতে নিছক্ আদর্শবাদ পরহিতৈষণা এবং আত্মসম্মানের দিক্ দিয়াও ইংলণ্ডের বহুলোক আবিসিনিয়ার প্রতি সহানুভূতিশীল। কিন্তু আজকালকার জগতে শুধু ওসব বড় বড় আদর্শের দ্বারা কেহই বড় একটা চালিত হয় না। ইংলণ্ডের চাঞ্চল্যের প্রধান কারণ এই যে, সত্য সত্যই যদি মুসোলিনি এই আবিসিনিয়া ব্যাপারে জয় লাভ করিতে পারে এবং প্রাকৃতিক ধনভাণ্ডারে সমৃদ্ধ অত বড় রাজ্য হস্তগত করিতে পারে, তাহা হইলে ত সমস্ত লোহিত সাগরই ইটালীর করায়ত্ত হইবে; এবং বিস্তীর্ণ ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-দেহের যে প্রধান নাড়ী—ভূমধ্য সাগর স্বয়েজ খাল লোহিত সাগরের মধ্য দিয়া যে নাড়ী প্রবাহিত—সেই নাড়ীই ত বিচ্ছিন্ন হইবার উপক্রম হইবে ; এই সমূহ বিপৎপাতের সম্ভাবনার তুলনায় মিশর দেশের নীলনদের জলপ্রবাহ-নিয়ন্ত্রণ ত তুচ্ছ ব্যাপার। তাই ইংলণ্ডের আপ্রাণ চেষ্টা যাহাতে একটা যুদ্ধ না বাধে। অথচ মুসোলিনির দম্ভ যাহাতে এক দণ্ডেই বন্ধ হইয়া যাইতে পারে তাহা হইতেছে ইংলণ্ডের determined attitude ; কিন্তু তাহা বর্ত্তমান বিলাতী নেতাদের কাহারও বুকের পাটায় কুলাইতেছে না। যদি ইংলণ্ড মুসোলিনিকে ultimatum দিতে পারিত—

বলিতে পারিত এসমস্ত বেয়াদবী চলিবে না, নচেৎ এই দণ্ডেই blockade করিয়া তোমাকে সায়েস্তা করিব—তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ এই সমস্ত রণ-নির্ঘোষ নীরব হইয়া যাইত। স্যার নর্ম্যাণ এঞ্জেল সত্যই বলিয়াছেন,

"If it were known to Signor Mussolini that Great Britain would defend the League with all her energy and resources, the Italian Dictator would have called off his adventure".

কিন্তু সে মেরুদণ্ড, সে দৃপ্ত তেজস্বিতা, ইংলণ্ডের বর্ত্তমান নেতৃবৃন্দের নাই। ইংলণ্ডের এই দুর্ব্বলতার ফলেই এই হাব্সী-সঙ্কট অচিরে একটা বিশ্ব-সঙ্কটে পরিণত হইয়া মানব-ইতিহাসের নূতন এক ভয়াবহ অঙ্কের সম্ভাবনা সূচিত করিতেছে।

ভাদ্র, ১৩৪২।